প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

গণতান্ত্রিক সমাজে অনিবার্যভাবেই যে অতিদরিদ্র শ্রেণী শহুরে এলাকায় গড়েওঠে অনিশ্চিত হলেও তাদের একটা জীবিকা থাকে, জানুক বা না জানুক তারাউৎপাদন প্রক্রিয়ার আবশ্যিক অঙ্গ এবং মুনাফায় অংশ না থকলেও তাদেরঅবদান ব্যতীত আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল। এই শ্রেণীর ভিতর থেকেই উপশ্রেণীরআকারে আর এক জনসমষ্টির বিকাশও এ সমাজের অব্যর্থ লক্ষণ ঃ উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় অথবা সমাজের কোনও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডেই এদের কোনওপ্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই, যে কোনও প্রকারে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনেরআয়োজনেই তাদের জীবনলীলার পরিসমাপ্তি এবং আকৃতিগত সাদৃশ্য ছাড়ামনুষ্যজীবনের সঙ্গে এদের কোনও সাদৃশ্য আছে কি না বলা মুশকিল। মানুষের অযোগ্য এদের জীবনের জন্যে তারানিজেরা কোনক্রমেই দায়ী নয়। কিন্তুদায়ী ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ বা সে দায়িত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণছোটগল্পকারের অবশ্য কর্তব্য নয়, অন্তত পটলডাঙ্গার পাঁচালিকারযুবনাশ্ব তা মনে করেননি। তবু যুবনাশ্বছদ্মনামের আড়ালে মনীশ ঘটকের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এই যে সাম্প্রতিক সভ্যতারসবচাইতে হতভাগ্য শিকার হয়েছে যারা তাদেরকে তিনি বাংলাসাহিত্যেস্বীকার করেছেন।

কিন্তু যুনাশ্বেরপটলডাঙ্গার বস্তিজীবন নিয়ে লেখা গল্প ‘কল্লোল’ পত্রিকায়প্রকাশেরও অন্তত ছ বছর আগে, প্রেমেন্দ্র মিত্র ‘পাঁক’উপন্যাস লেখা শু করেন। তখনপ্রেমেন্দ্র মিত্র ইস্কুলের ছাত্র, সে উপন্যাস কোথায় কেমন করে প্রকাশকরা যায় সে বিষয়ে তখন তাঁর কোনও ধারণাই ছিল না। ‘পাঁক’ উপন্যাস যখন লেখা শুকরেছিলেন সেকালে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ এদেশের মাটিতে এসে পৌঁছায়নি এবং শ্রমিকশ্রেণীর জীবন অবলম্বনে সাহিত্য রচনার কল্পনাটাও ছিল অবাস্তব—আসামের চা-বাগানগুলোতে কুলিদের অবস্থা সম্বন্ধে ভারতের জাতীয়কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে আলোচনা উত্থাপনের চেষ্টা করেছিলেনদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কিন্তু কংগ্রেসের নেতারা তখন বিষয়টাকে আলোচনাযোগ্য মনে করেননি এবং কুলিদের প্রতি মানবিক ব্যবহার সম্পর্কিতপ্রস্তাবকে দ্বাদশ কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয়গুলির তালিকাভুক্তকরতেই দ্বারকানাথকে দশ বছর ধরে চেষ্টা করতে হয়েছিল। শ্রমিক শ্রেণী সম্বন্ধে জাতীয় নেতাদেরমনোভাবই যেখানে দ্বিধান্বিত সেখানে স্বভাবতই কারও কাছ থেকে বালকপ্রেমেন্দ্র মিত্র ‘পাঁক’ লিখতে উৎসাহ পাননি, উপরন্তুপরিচিতদের অনেকের বিরূপ মন্তব্যের চাপে উপন্যাসটি অসমাপ্তঅবস্থায় রেখে দেন। সেসময় তাঁদেরঘরোয়া পাঠচক্র ‘সচল সংঘের’ জন্যে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেনযাতে কোনও মার্কিন শিল্পপতির দানশীলতা সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, যেব্যবস্থায় একজনের হাতে দান করার মতো উদ্বৃত্ত বিত্ত সঞ্চিত হয় আর একদলের জীবন তার উপর নির্ভরশীল হয় সে-ব্যবস্থাটাই খারাপ। তখনই তাঁর মধ্যে আদর্শায়িত মানবিকবাদেরউন্মেষ হয়েছিল, জীবন ও সমাজের প্রতি তখনই তাঁর চেতনা ছিলসজাগ ও সন্ধানী। উদীয়মান সাহিত্যিকরূপে স্বীকৃতিলাভের পরে তিনি ‘পাঁক’ লেখা শেষ করেন, ফলেউপন্যাসটির শেষাংশে স্বভাবত মানবিকবাদের উপরে অর্জিত জ্ঞানের ছাপপড়েছে।

‘পাঁকে’রঅশান্ত কর্মকার চরিত্রের ও নামের তাৎপর্যে এক নতুন সৃজনচঞ্চলপ্রজন্মের আগমন-বার্তা ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু কায়ার পেছনেছায়ার মতো এই

প্রজন্মের পেছনে যে অপমানুষের মিছিল আসছে সেকথাও প্রেমেন্দ্র মিত্র বুঝেছিলেন আপন সহজ জীবনদৃষ্টি দিয়ে। গোপাললাল সান্যাল সম্পাদিত'আত্মশক্তি' পত্রিকায় যখন তাঁর 'ফুটপাথে' নাটকটিপ্রকাশিত হয় তখন পর্যন্ত শহুরে জীবনের একেবারে নিচুতলারঅন্ধকারাচ্ছন্ন অভিশপ্ত আশাহীন মানুষদের দিকে কেউ সহানুভূতির সঙ্গেদৃষ্টিপাত করেননি, উপরন্তু তা করা ছিল অনেক জাতীয়বাদীদের চোখেওনিন্দনীয়। এবিষয়ে যুবনাশ্ব ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাগ্য একইসূত্রে বাঁধা পড়েছিল ঃ যুবনাশ্বের'পটলডাঙ্গার পাঁচালী' গ্রন্থাকারে বেরোয় মাত্র ১৯৫৭খ্রিস্টাব্দে আর 'ফুটপাথে' আজও বেরোয়নি, বোধহয় তাচিরতরে হারিয়েই গেছে, তবে 'পাঁক' গ্রন্থাকারে বেরোয়তাঁর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার পরে। একথা কে ভুলতে পারে যে তিনি একদা ঘোষণা করেছিলেন,'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের মুটেমজুরের—আমি কবি যত ইতরের!' এই ঘোষণায় রোমান্টিক আবেগই প্রধান ছিল বটে, তবু তাছিল বলেই ঐতিহাসিক বিচারে প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলা সাহিত্যে এক নতুনচিন্তাধারার পথিকৃৎ। প্রথম প্রয়াস থেকেই প্রেমেন্দ্র মিত্রএক কঠিন ও প্রশস্ত জীবনবোধের ভিত্তির উপরে তাঁরসাহিত্যসৌধকে গড়ে তোলার জন্যে সচেষ্ট ছিলেন।

তবুও আবেগেরবশে যে শ্রেণীর কবি হওয়ার বাসনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথম যৌবনে উদ্বেলিতহযেছিলেন সে শ্রেণীর সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক অথবা প্রাত্যহিক অনুভবের ক্ষেত্রে তিনি একাত্ম হতে পারেন নি। না পারার যথার্থ কারণ অবশ্যই ছিল। জন্মসূত্রে তিনি শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্গে বাঁধা, তিনি সে যুগেরমানুষ যখন এদেশের শ্রমিক আন্দোলন কোনও সুস্পষ্ট কিংবা গৌরবময় রূপ লাভকরেনি, শ বিপ্লবের কাহিনী শিক্ষিত মানসে চাঞ্চল্য জাগিয়েছে বটেকিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ সম্বন্ধেএবং সেই দৃষ্টিতে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা ওতার গুত্ব সম্বন্ধে এদেশের মাটিতে কোনও সুসংবদ্ধ ধারণা গড়ে ওঠেনি,তথাপিও প্রথম সমরোত্তর সেউ যুগেই এদেশের প্রগতিশীলচিন্তার ক্ষেত্রে অনভিজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্ব অবিসংবাদিত রূপেস্বীকৃতি পেতে শু করেছে। 'পাঁকে'র পাণ্ডুলিপি ছ বছরপরে বই হিসেবে বের করে প্রেমেন্দ্র মিত্র দুটি সত্য হৃদয়ঙ্গম করলেন -- এক,নিম্ন শ্রেণীর প্রতি আগ্রহকে সারস্বত সমাজ প্রসন্নদৃষ্টিতে দেখতেরাজি নয়, দুই, এটাই শিল্পীর পক্ষে জরি উপলব্ধি,অন্তরঙ্গভাবে চেনা সমাজ, যার সঙ্গে শিল্পীর শুধু সহানুভূ তির নয়,সমানুভূতির সম্পর্ক, বিশেষত যে-সমাজ নেতৃত্বের গৌরবে আসীন সেই সমাজেরএকজন তাৎপর্যময় চিত্রকর হলেই তাঁর সাহিত্যিক সার্থকতা আসবে। সোজা কথায়, নিজের পরিবেশ ও সামর্থ্য বুঝেপ্রেমেন্দ্র মিত্র নিজের সাধনার ক্ষেত্র ও তার পরিধি নির্ধারণ করলেন।

ফলে প্রেমেন্দ্রমিত্রের মধ্যে সাধনীয় বিষয়ের সমস্যার আপাত সমাধানের আড়ালে সাধ ও সাধ্যেরএকটা দ্বন্দ্ব থেকেই গেল, কেননা যে লক্ষ্যকে বিদ্ধ করা ছিল তাঁর সাধ তাবিদ্ধ করা তাঁর সাধ্যে কুলোবে না বুঝে তিনি সাধ্য অনুসারে নিকটতর একলক্ষ্যকে বিদ্ধ করতে চাইলেন। কিন্তু এই লক্ষ্য পরিবর্তনের জন্যে অসন্তোষ যাবে কোথায়? দেশ, কাল ও পাত্রেরপরিপ্রেক্ষিতে সাধ ও সাধ্যের এই ব্যবধান যেমন বৈষয়িক বিচারেশ্রেণীদ্বন্দ্ব থেকে তেমনই শিল্পের বিচারে শিল্পীর প্রকটিত আত্মদ্বন্দ্বথেকে উৎসারিত। এই দ্বন্দ্বে প্রেমেন্দ্রমিত্রের সাহিত্যসাধনাকে অনেক সময় লক্ষ্যহীন মনে হতে পারে, কিন্তুপ্রকৃতপক্ষে তা কোনও ধ্রুব-সত্য নির্ধারণের ক্রমাগত প্রয়াসেএবং অনিশ্চয়তা ও অসন্তোষের তাড়নায় অস্থির পদপাতে নানাচারী,আবার একই সঙ্গে এই সাহিত্যসাধনা শিল্পের নিগূঢ় স্বাশ্রয়ী ব্যঞ্জনায় একসুদূর প্রসারী অর্থময়তায় সুগভীর ও সুসংহত রূপ লাভ করেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরাট যে-অংশের অর্থনৈতিকতথা সামাজিক মর্যাদা নেই বা থাকলেও নগণ্য, যাদের অন্নসংস্থানের ওসাংসারিক নিরাপত্তার প্রশ্ন সাধারণত সর্বদাই উৎকণ্ঠায় কন্টকিত,অথচ স্নায়ুতে তন্তুতে শহুরে জটিলতা অব্যর্থরূপে প্রবিষ্ট হলেও যাদেরমধ্যে 'পুন্নাম'- এর নায়ক ললিতের মতো মানবিক মূল্যবোধগুলিদুর্মর কীটের মতো সক্রিয় তাদেরই জীবন ভাষ্য রচনা করেছেন তিনি। প্রেমেন্দ্র মিত্র শুধু মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্রকরনন, ভাষ্যকারও , একাধারে দুই-ই।

পরিচিতি মহলে'পাঁক' ও 'ফুটপাথে'র প্রতিক্রিয়ায় প্রেমেন্দ্রমিত্র বুঝি-বা নিজের সাহিত্যিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে ডাক্তার হওয়ারদুরাশায় বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েছিলেন। এসময়'শুধু কেরানি' আর 'গোপনচারিণী' নামে দুটি গল্পতখনকার শ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'প্রবাসী'তে পাঠিয়ে দিলেন পরেযে দুটি গল্প যথাক্রমে 'বেনামী বন্দর' আর 'পঞ্চশর'-এসংকলিত হয়। একেবারে নতুন লেখকেরলেখা 'প্রবাসী'তে বেরোত না বলে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যেগল্প দুটি ছাপা হবে না। কিন্তুপরপর দুটি সংখ্যায় গল্প দুটি প্রকাশিত হয়ে লেখককে রাতারাতিবিখ্যাত করে তুলল। ''তখনপাখিদের নীড় বাঁধবার সময়'', এই ভাষণে শু হয়েছিল 'শুধুকেরানি' আর 'গে

াপনচারিণী'-র প্রথম বাক্য ছিল'মনে আছে সেটা আকাশপ্রদীপ দেওয়ার মাস'। লক্ষণীয় যে দুটি গল্পের একেবারেশুরেতেই বছরের কোন ঋতুচেতনাই ব্যাপকতর অর্থে হলো কালচেতনা এবংকাল বিশেষ সম্বন্ধে চেতনা সম্যক হলেই দেশ ও পাত্রের পারস্পরিক সম্পর্ককে, ওসে-সম্পর্কের মধ্যে সমস্যা থাকলে সে-সসম্যাকে মূর্ত রূপে অনুধাবন করা সম্ভব । সে অনুধাবনার জন্যে আগ্রহ গল্পদুটিতে আছে, কিন্তু তার সুষ্ঠু প্রকাশ হয়নি, কেননা জীবন ওশিল্প সম্বন্ধে লেখকের অভিজ্ঞতা তখনওঅপরিণত। তুবও দুটি ছোটগল্পেইসংকীর্ণ অর্থে কালচেতনার সঙ্গে বিষয়বস্তুর যে মিলন ঘটানো হয়েছে তার থেকেই বোঝা যায় যে ছোটগল্পের শিল্পরূপ স ম্বন্ধেএমন একটা বিস্ময়করবোধ নিয়ে এই লেখক বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছেন যে বোধ অত্যন্তপরিণত ও পরিপূর্ণ।

বছরেরযে-সময়টায় পাখিরা নীড় বাঁধে সে সময়ে 'শুধু কেরানি' গল্পেরশু ঃ পাখির নীড় মানে একটা অস্থায়ী বাসা, যার মেয়াদ দু মাসেইফুরিয়ে যায় যখন কালবৈশ াখীর ঝড়ে তাদের বাসা উড়ে যাবে, তেমনইকলকাতার অল্প মাইনের কেরানিদের সুখের বাসা, দু দিন যেতে না যেতেইপরিবেশের চাপে তাদের সে বাসা ভেঙে য ায়। পাখিদের নীড় বাঁধার ও নীড় ভাঙার দুটি চিত্রকল্পের দুপাড়ের মধ্যে এক কেরানি দম্পতীর সুখদুঃখের কাহিনী বলা হয়েছে 'শুধু কেরানি' গল্পে। আবার'গে াপনচারিণী' গল্পের ঋতু হলো হেমন্ত যখন দিনের প্রখরউজ্জ্বলতা মিলিয়ে যেতে শু করে, কুহেলির গুণ্ঠনে গোধূলি আসে রহস্যময়ীহয়ে, যখন নক্ষত্রের স্বপ্নলোকের দিকে বাংলার গ্রামে গ্রামেআকাশপ্রদীপ তুলে ধরা হয়, যেন তা স্বর্গের স্বপ্নেরইপ্রতীক। কোনও স্বপ্নইস্থায়ী হয় না, আকাশপ্রদীপও বারোমাস তুলে ধারা হয় না, অ াবারবাস্তবের প্রখরতায় মানুষ ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে, তবু মনের কোনওসুদূর কোনে স্বপ্নের ভালোবাসা আর রহস্য লেগে থাকে। সেইভালোবাসা ও রহস্য বুঝি ম ানুষ একই জীবনে একাধিকবার আবিষ্কার করতেও পারে,তখন আবার তা প্রথমবারের মতোই নতুন ও রহস্যময় মনে হয়, তাকে অন্যএক জন্মের স্মৃতি বলে মনে হয়। গোপনচারিণীকে যে আবার তেলেনাপোতায় কি অন্য কোনওখানেখুঁজে পাওয়া যাবে না, তা-ই বা কে বলতে পারে। আকাশপ্রদীপের মতোই সে শুধু স্বপ্নে ভর ানক্ষত্রলোকের জন্যে মানুষের চিরন্তন এক আশার প্রতীক ঃ অজস্রজন্মান্তরেও যার ক্ষয় নেই, বিনাশ নেই। যদিও তার আসা-যাওয়া সব সময় টের পাওয়াযায় ন া, বোঝা যায় না তা আমাদের মনের গহনে কখন আছে কখন নেই।

১৯২৩খ্রিস্টাব্দে 'প্রবাসী'তে সেই প্রথম আত্মপ্রকাশেই প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলা সাহিত্যে একটি সুদৃঢ় স্থান করে নিয়েছিলেন এবং দুটি গল্পেই তাঁর ভবিষ্যৎপরিণতির সন্ধ ানও পাওয়া যায়। 'শুধু কেরানি' মাত্র দুটি চরিত্রকে নিয়ে লেখা ঃ ছেলেটিমার্চেন্ট অফিসের কেরানি আর মেয়েটি বাংলার নগণ্য একটি কেরানিরকিশোরী বধূ ঃ পরিপূর্ণ সংসার গড়ে তোলার জন্যে তাদের মধুর স্বপ্ন অকালে ভেঙে যায়মেয়েটির এমন এক কঠিন অসুখে যা চিকিৎসা করার সঙ্গতি তাদের মতোমানুষের থাকে না, উৎকণ্ঠায় জর্জরিত স্বমীকে বারবার মেয়েটি আশ্বাস দেয়যে সে সেরে উঠছে অথচ দুজনেই জানে যে এ -আশ্বাস মিথ্যে কথা ছলনা ছাড়া কিছুনয় এবং মেয়েটির মৃত্যুর আগে সে ছলনাটাও ভেঙ্গে যায়। গল্পটি শু হয়েছে গড়ে তোলার জন্যেমানুষের সহজ ও স্বাভাবিক আকুলতাকে নিয়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবটাইদাঁড়ায় একে একে ভেঙ্গে যাওয়ার কাহিনীতে। দুটি মাত্র মানুষেরই কাহিনী 'গোপনচারিণী'-ও , কিন্তুদুজনের মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, কখনও তাদের মুখোমুখিসাক্ষাৎ পর্যন্ত হয় নি, এমন কী গোটা গল্পে একটি চরিত্রেরঅস্তিত্বটাকেই অস্পষ্টতার অন্তরালে প্রায় অশরীরীঅবস্থায় রাখা হয়েছে, যেন সে আমাদের পরিচিত পৃথিবীর ম ানুষই নয়, অথচ নেপথ্যে তার উপস্থিতিও অনুভূত হয় এবং সবচেয়েলক্ষণীয় যে গল্পটি ঘটেছে সন্ধ্যা বা রাত্রির অন্ধকারে আর সেইঅন্ধকারে প্রদীপের অনতিস্ফুট ক্ষীণ আলো হয়ে উঠেছে এক অব্যক্তরহস্যের মূর্ত রূপ।

অপরাহতবস্তুলোকের কঠিন নিষ্ঠুর বিধবংসী পরাক্রমের মুখে সামান্য মানুষেরভাষাহীন নিপায় আর্তি আর ওই সামান্য মানুষেরই আপন নৈমিত্তিক সীমা থেকেবের হয়ে কল্পলোকের উদ্দেশে অভিসারের গভীর আনন্দ — এই দুটোইপ্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পগুলির মৌল বোধ যা অপূর্ব সাংকেতিকতায়পুনঃ পুনঃ অভিব্যক্ত। 'শুধু কেরানি' ও 'গোপনচারিণী'র উক্ত বোধ দুটি ক্রমশএকান্তর সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে আরও অজস্র মাধ্যমিক বোধে —মানবচরিত্রের বহু অজ্ঞাত, প্রান্তিক ও লুক্কায়িত কোণে লেখকেরনিরন্তর তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিসম্পাতের প্রতিফলিতআলোতে। 'পঞ্চাশর'গ্রন্থের প্রথম গল্পের নায়িকা চিত্রার চরিত্রে উত্তুঙ্গঅহঙ্কারই অসাধ্য বাধা হয়ে উঠেছে তার একান্ত সমর্পণের,'বেনামী বন্দরের' অন্তর্গত 'এই দ্বন্দ্ব' গল্পটিতে অসীমঘৃণার সঙ্গে মিশেছে অদম্য প্রেম, আবার 'সাগর সঙ্গমে' সংস্কার ওরুচির নীরেট নির্দেশের উপরে জয়ী হয়েছে দাক্ষায়ণীর অকপটমাতৃহৃদয়। আবার'স্টোভ' গল্পটিতে স্বামীর পূর্ব প্রণয়িণীরপ্রতি বাসন্তীর আক্রোশ যখনই গর্জন্ত স্টোভটার মতো

হিংস্র হয়ে উঠেছে তখনই তার মধ্যে শু হয়েছে সে আত্রোশকে সম্পূর্ণ শাসনেরাখার মরিয়া সংগ্রাম। প্রত্যক্ষ অভিপ্রায়ের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিসত্তারবিরোধ প্রেমেন্দ্র মিত্রকে সর্বদা আকৃষ্ট করে এবং মানুষের চরিত্রমাত্রেইতাঁর কাছে অপার রহস্যের খনি। তাঁর ছোটগল্পগুলির শুতে এক-একটি চরিত্র যে-রূপেউপস্থাপিত হয় সেটা পাঠকের কাছে প্রথমে চরিত্রের সম্পূর্ণস্বরূপ বলেই প্রতিভাত হয়। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র জানেন যে জলে ভাসমান বরফ খণ্ডের যেমন নভাগের মাত্র এক ভাগ জলের উপরে বাকি আট ভাগ জলের নীচে থাকে তেমনইমানুষের চরিত্রের বেলাতেও যেটুকু গুণ সাদা চোখে ধরা পড়ে সেটুকু সম্পূর্ণের তুলনায় একেবারেইতুচ্ছ আর বেশিটাই থাকে গুপ্ত। তাই তাঁর ছোটগল্পের শুতে চরিত্রের যে প্রাথমিকগুণ প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে অতিত্রম করে অন্য কোনও গুণ, যাপ্রায়শই বিপরীত গুণ,কাহিনীর অগ্রগতিতে ত্রমশ প্রকাশিত হতে থাকে ঃ চরিত্রের নতুন নতুনগুণ বা রূপের প্রকাশ এমন সূক্ষ্ম অথচ অনিবার্যভাবে, এমন অলক্ষ্যেঘটে যে প্রথম পাঠে এই প্রকাশের সূচনা মুহূর্তটা সম্বন্ধেঅবহিতহওয়ার সুযোগই পাঠকের জন্যে থাকে না। এবং এই সুযোগহরণে প্রেমেন্দ্র মিত্র সর্বদাই অত্যন্ত যত্নপর।

প্রকৃতপক্ষেপ্রেমেন্দ্র মিত্র যেভাবে তাঁর সমস্ত উৎকৃষ্ট ছোটগল্পেএক-একটি চরিত্রের নিগূঢ় রহস্যকে উদঘাটন করেন তাতে মনে হয় না যেগল্পরচনায় তাঁর কর্তার ভূমিকা আছে, মনে হয় তিনি শুধু নিমিত্ত, কেননাএই অধ্যাস তিনি নিপুণভাবে সৃষ্টি করেন যাতে মনে হয় যেলেখক-নিরপেক্ষ রূপে চরিত্রগুলি ঘটনার বা পরিস্থিতিরপ্রতিত্রিয়ায় আপনা থেকে আত্মপ্রকাশ করে। অরণ্যের অন্ধকারে পুরন্দর ও সুনন্দাঅত্যন্ত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু শহরে ফেরার পথে যখনকৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত চংাদ উঠল তখন ওই অন্তরঙ্গতার মোহকেটে গেল, 'যে চাঁদ রহস্যময় করে তোলে পৃথিবীকে, সেই চাঁদইতাদের পৃথক করে দিল'। জ্যোৎস্নার এই বিপরীত ত্রিয়াই যেন মানবচরিত্রের আপাতসঙ্গতির অন্তরালে নিহিত দুর্বোধ্য জটিলতা ও বিরোধিতার প্রতিঅভ্রান্ত ইঙ্গিত। তাই'অরণস্বপ্ন' গল্পটির পরিসমাপ্তিতে নিষ্পি দর্শক হিসেবেরঙ্গালয় থেকে বের হতে হতে মন্তব্য করার মতো ভঙ্গিতে পুরন্দরেরচরিত্র সম্বন্ধে লেখক বলেছেন, 'তার প্রকৃতি অদ্ভুত, যেঅনুশাসনেরবিদ্ধে তার মন বিদ্রোহ করে তাই সে না মেনে পারে না। সে অরণ্যে সান্ত্বনা খুঁজতে যায় কিন্তু সভ্যতারঅভ্যাস পরিত্যাগ করে না।' আরওতলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে এই প্রকৃতি পুরন্দর নামক কোনওব্যক্তিবিশেষের নয়, পুরন্দর যে শ্রেণীর অন্তর্গত, সাধারণভাবে এটা সেই শ্রেণীর সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সে যে কোন্ সামাজিক শ্রেণীর একজন সে কথাবুঝতে পাঠকের দেরি হয় না। ব্যষ্টি চরিত্রে বৈশিষ্ট্য থেকে সমষ্টি চরিত্রেরউপরে আলোক প্রসারণ প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনেক গল্পকেই একটিব্যাপক সাংকেতিকতায় আবৃত করে রেখেছে।

প্রকৃতপক্ষেআমাদের মনের ভিতরে কোথায় কোন কামনা, কোন বেদনা, কোন বিদ্বেষ, কোনস্নেহ, কোনপ্রেম, কোন মমতা বা কণা আত্মগোপন করে থাকে তা আমরা নিজেরাই নিশ্চিতভাবে জানিনে, যখন বিশেষ ঘটনার পটে ওইসব বোধবৃত্তিগুলিরঅস্তিত্ব সম্বন্ধে অব্যর্থ পরীক্ষা হয় শুধু তখনই জানতে পাই। অর্থাৎ বিভিন্ন বোধবৃত্তির কোনটি কারচরিত্রে কী পরিমাণে আছে সে সম্বন্ধে অনুমান ও সংশয় মানুষের চরিত্র-জিজ্ঞাসারএকেবারে মূলকথা। এ কারণেপ্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনায় 'বুঝি','বোধহয়' ইত্যাকারঅনুমান বা সংশয়-জ্ঞাপক শব্দের আবার সে সঙ্গে মানবচরিত্রের অন্তর্নিহিতজটিলতাবোধক ব্যাকরণিক জটিল বাক্যের প্রাদুর্ভাব দৃষ্টিগোচরহয়। প্রথম যৌবনের একটি কবিতায় তিনি দাবি করেছিলেন,'মানুষের মানে চাই, গোটা মানুষের মানে'। সেই মানে, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন'প্রতিবোধবিদিত সত্য' সেটাকেই প্রেমেন্দ্র মিত্র বারবারখুঁজেছেন। তিনি দেখেছেন যে মানুষের মধ্যে বহু বিচিত্র ও বিবাদী বৃত্তি ও কূটৈষাসহ-অবস্থান করে এবং এর ফলে মনুষ্যচরিত্র শুধু জটিল নয়, বর্ণসমৃদ্ধ ওআকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

তাইপ্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পগুলি একদিকে যেমন মানুষ সম্বন্ধেআমাদেরঅভিজ্ঞতাকে প্রতিপদে প্রশস্ত করে তোলে তেমনই অন্যদিকেতাকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে শেখায়। তাঁর কোনও চরিত্রই আগাগোড়া পূজ্য বা ঘৃণ্য নয়। 'সত্য-মিথ্যা' গল্পের নায়কঅপূর্ব একজন ঘোর মিথ্যেবাদী, সে নিষিদ্ধ পণ্যের চোরচালানদার এবং দাণপ্রতারক, তার প্রতি পক্ষপাতী হওয়া কঠিন, কিন্তু তারকথাবার্তায় এমন একটা জীবন্ত ভাব আছে যা লেখকের মনকে টানে এবং তারসম্বন্ধেসবকথা জানার পরেও একটি পরিচয় জানা বাকি থাকে— সেটা হচ্ছেপিতা হিসেবে অপূর্বের পরিচয়। লেখক অপূর্বের অন্যান্য সমস্ত পরিচয়ের অন্তরালেইতার এই পরিচয়টা আত্মগোপন করে থেকেছে আগাগোড়া, গল্পের মধ্যেকখনও কখনও তার এই পরিচয় এমন সাবধানে উঁকিঝুঁকি মেরেছে যেঅসতর্ক বাব্যস্ত পাঠকের দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ার কথা নয়, তবু গল্পেরঅন্তিম পরিণামে তার অন্য সব পরিচয়কে ছাপিয়ে উঠেছে পিতা হিসেবেতার পরিচয়।তখন বোঝা গেল যে যা ছিল অস্পষ্ট আসলে তা অভ্র

ান্ত, যাছিল ক্ষীণ সেটাই সবচেয়ে তীব্র এবং আর সব পরিচয়ের সঙ্গে এইঅভ্রান্ত ও তীব্র পরিচয়কে মিলিয়েই মানুষ হিসেবে অপূর্বের সম্পূর্ণপরিচয় একথা জানার পরে অপূর্বকে কণার চোখে দেখতেই হয়।

প্রেমেন্দ্রমিত্রের অধিকাংশ গল্পেই মানুষের সম্বন্ধে পাঠকের প্রাথমিক অভিজ্ঞতাও ধারণার সঙ্গে অন্তিম অভিজ্ঞতা ও ধারণার অসঙ্গতি চোখে পড়ে, ঘটনার ব াচরিত্রের যে দিকটা চোখের সম্মুখে আছে সেটার সঙ্গে যে দিকটা চোখেরআড়ালে আছে সেদিকটাকে মিলিয়ে মানুষের মূল্যায়নেই তাঁর শিল্পশক্তি। 'বাহির হইতে দেখো না এমন করে,আমায় দেখো না বাহিরে,' একথা নিজের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন এবংতাঁরই একথা লেখার অধিকার আছে, কিন্তু স্পর্ধার মতো শোন ালেও এই একইকথা প্রেমেন্দ্র মিত্রের অধিকাংশ চরিত্র—'সিদ্ধিকল্প'-এরধরণীধর গাঙ্গুলি, 'অনাবশ্যক'-এর স্বর্ণময়ী, 'স্টোভ'-এরবাসন্তী, 'ভূমিকম্প'-এর মালতী, 'জীবন-সীমায়'-এরমাধব এবং এরকম আরও অনেকেই বলতে পারে, কেননা এদের সকলকেই পল্লবগ্রাহীচোখে দেখলে যেমনটি প্রতিভাত হয় তলিয়ে দেখলে বা গভীরতর অনুধাবনেতেমনটি হয় না।

বাস্তবঅভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে সংসারে সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত ব্যাপার হামেশাইঘটে, নীচ প্রকৃতির মানুষ হঠাৎ মহত্ত্বে উদ্বুদ্ধ হয়, অত্যন্ত উদারমানুষ তুচ্ছ প্রসঙ্গে দাণ স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়, নিতান্তনির্বিরোধ মানুষ হঠাৎ ভয়ঙ্কর হিংস্র হয়ে ওঠে এবং এজাতীয় ঘটনা দৈনিকসংবাদপত্রের খোরাক জোগায়। কিন্তুবাস্তবে এরকম ত্রিয়াপ্রতিত্রিয়ার নিদর্শনগুলোকে চিত্ররূপদেওয়া কঠিন, কারণ বাস্তবের প্রতিচিত্রই নয়, শিল্পের দায় হলবাস্তবের যথার্থ্য অন্বেষণ। প্রতিচিত্রণ থেকে আসে সাংবাদিকতা, পক্ষান্তরেবাস্তবের যথার্থ্য প্রতিপন্ন না করলে কোনও প্রয়াসই শিল্পহয় না, যদি কোনও প্রেমমুগ্ধ দম্পতীর মধ্যে অকস্মাৎ প্রেমেরচাইতে শূন্যতা বা বিরক্তি প্রকাশ পায় তাহলে শিল্পীকে এইপরিবর্তনের প্রতিবেদন দিলেই হবে না, তাদের সম্পর্ক কোন ধারাতেপ্রবাহিত হয়ে, কোন কোন স্তরে পরিশ্রুত হয়ে এই পরিবর্তিতরূপ লাভ করেছে সেটাকে প্রকাশ করতে হবে।

'যাত্রাপথ' গল্পের শেষেমলিনার মনে হয়েছে, 'কোথায় সে নিদাণভাবে যে আঘাত পাইয়াছে তাহা সেনিজেও বুঝাইতে পারিবে না, কিন্তু হঠাৎ তাহার সমস্ত জীবন যে ন শূন্যহইয়া গিয়াছে,' আর অজয়ের 'মনে হইল, এই নিতান্ত সাধারণমেয়েটিকে চিরজীবনের বোঝারূপে বহন করায় কোন উন্মাদনাইনাই।' এ গল্পে স্বামী-স্ত্রীরসম্পর্কের স্বাশ্রয়ী পরিবর্তনকে অত্যন্ত সুকৌশলে, স্বল্প কথায় ওসূক্ষ্মভাবে দেখানো হয়েছে। অনেক দিনআগে বিয়ে হলেও ঘটনাচক্রে মলিনাকে এতক াল পিতৃগৃহেই থাকতে হয়েছে, এইপ্রথম তাকে নিজের কর্মস্থল নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে অজয়। পরস্পরের প্রতি গভীর মোহে তাদেরযাত্রা শু হলো, কিন্তু কয়েকটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে সে মোহ কেটে যেতে থাকে ঃঘটনাগুলোর কোনওটাই তেমন উল্লখযোগ্য নয়, কিন্তু তার প্রত্যেকটিরসমষ্টিফল তাদের জীবনের ভিত্তিতে চিড় ধরিয়ে দিয়েছে এবং গল্পটিশেষ করার পরে বোঝা যায় যে ওই উপেক্ষণীয় ঘটনাগুলোরপ্রত্যেকটি আসলে উল্লেখ্য বিধবংসী শক্তিতে পূর্ণ। হাওড়া স্টেশনে অজয় যখন মুটের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তখন থেকেই এই শক্তি মলিনার মনে কাজশু করেছিল, কিন্তু মলিনা নিজেও তখন সেটা টের পায় নি, স্টেশনেফিরিওয়ালার সঙ্গে অজয়ের শঠতাকে, এমনকী বর্ধমান স্টেশনে সীতাভোগমিহিদানার ঠোঙা পড়ে যাওয়ার পরে স্বামীর বকুনিকেও মলিনা আমল দিতেচায়নি, বরং মনে মনে ভেবেছে, 'এমন তুচ্ছ জিনিস ধর্তব্যই নয়, যেখানেতাহাদের সত্যকার আনন্দলোক সেখানে ত ইহার স্থানই নাই।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো তুচ্ছজিনিস নয়, দূর অর্থবোধক অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এক-একটিচরিত্রের অব্যর্থ নির্দেশক, চেস্টারটনের ভাষায় 'ট্রিমেণ্ডাসট্রাইফ্লস', এবং এগুলির নির্বাচনে লেখকও সূক্ষ্মদৃষ্টিরপরিচয় দিয়েছেন। এর পরে নিজেরচারিত্রিক ক্ষুদ্রতাকে ঢাকবার জন্যেই যেন অজয় এক প্রেমের গল্পফেঁদেছে যাতে সে নায়ক এবং তার জন্যে পাগল যে মেয়েটি সে প্রায় একজন রাজকুমারীই, কিন্তু অর্ধেকরাজত্ব আর রাজকন্যাকে অজয়ের মতো সত্যকাম গ্রহণ করতে পারে না। গল্প বলতে বলতে অজয় আত্মবিস্মৃত হয়েসত্যিই নিজেকে অত্যন্ত অসাধারণ পুষ বলে কল্পনা করতে শু করেআর মলিনাকে তুলনায় নিতান্ত সাধারণ মনে হয়। স্বামীর সম্বন্ধে মলিনার মনে যে আদর্শ মূর্তিছিল সেটা একেবারে ভেঙে গেল আর স্ত্রীর সম্বন্ধে অজয়ের যে কল্পনা ছিল, যাতার বানানো গল্পে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, সেটাও বদলে গেল, দুজনেরমধ্যেকার স ম্পর্কটা আস্তেআস্তেঅথচ নিশ্চিত ও সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্যরূপে হয়ে উঠল অস্বাভাবিক।

স্বামী-স্ত্রীরসম্পর্কের এই বিকৃতি আরও ভয়ঙ্কর ও শোচনীয় রূপ পেয়েছে'হয়তো' ও 'শৃঙ্খল' গল্পদুটিতে। 'হয়তো' গল্পে দাম্পত্যসম্পর্কের অস্বভাবিকতার উপরে

মহিমের বংশধারা ও রহস্য পুরীরপরিবেশের প্রভাব কাজ করেছে ঃ এই বংশধারার প্রসঙ্গে মাধুরীবলেছে, 'সাতপুষ ধরে মেয়েমানুষের এমন অপমান লাঞ্ছনা নেই, যাকরেনি। তাদের সে অভিশাপ যাবেকোথায় ?' আর রহস্যপুরীরআতঙ্কসঞ্চারী রূপ তো লাবণ্যের চোখের সম্মুখে সর্বদাইউপস্থিত, গল্পটিরশ্বাসরোধকারী আবহাওয়াকে বৈপরীত্যে প্রকট করে তুলেছে মাধুরীচরিত্রের প্রখর উজ্জ্বলতা। গল্পের শুতেই দুর্যোগের রাত্রিকে মূর্তকরা হয়েছে এক পরাক্রান্ত চিত্রকল্পে ঃ 'নির্জন পথের যেখানেযেখানে গ্যাসের আলো পড়িয়াছে, সেখানে মাটি আর চোখে পড়ে না— শুধুবৃষ্টিধারাহত জল চিকচিক করিতেছে দেখা যায়। পথের ধারের গাছগুলি ঝড়ের তাড়নায়অসহায় বন্দীর মত মাটির শৃঙ্খল ছিঁড়িবার জন্য উন্মত্ত হইয়াউঠিয়াছে।' বর্ণনার সংযম, শব্দেরপরিমিত যথাযথ প্রয়োগ এবং অর্থপূর্ণ অলঙ্কারের সুচিন্তিতনির্বাচন লক্ষণীয়, গাছগুলির মতো পরিবেশের দৃঢ় বন্ধন থেকে মুক্তির জন্যে আকুল মহিম-লাবণ্যেরএবং চিকচিক জলের সঙ্গে মাধুরীর একটা উপমাও এখানে সঙ্গোপনে প্রচ্ছন্নআছে। মহিম ও লাবণ্যের সঙ্গে পাঠকেরপ্রথম সাক্ষাৎ হলো দুর্যোগের রাত্রিতে একটা অর্ধসমাপ্ত সেতুরউপরে এবং নদীর দুপারের মধ্যে মিলনের সেতুটা যে অসমাপ্ত এটাও তাদেরঅপূর্ণ দাম্পত্য সম্পর্কের একটা উপমা—সেই সম্পর্কটা অত্যন্তঅস্বাভাবিক, একটা অনিবার্য অবক্ষয়ের সংগ্রামে কলুষিত ও বিকৃত। প্রকাণ্ড সাত মহলা দালানেরভগ্নাবশেষ, পিসিমার বীভৎস জরামূর্তি, তাঁর বিপুল গোপন সম্পদইত্যাদি একটা যুগ ও শ্রেণীর অবক্ষয়ের কতকগুলি ইতস্তত চিহ্নমাত্রহলেও গল্পের শরীরে এমন নিপুণ ও নিবিড়ভাবে যুক্ত যে প্রত্যেকটিইহয়ে উঠেছে অশেষ অর্থময় প্রতীক। 'হয়তো' গল্পটিতে লেখকের কল্পনা শক্তি ওপ্রতীক প্রয়োগের রীতি যে উচ্চতায় উন্নীত,'শৃঙ্খল'-এ তা হয়নি, কিন্তু প্রত্যক্ষ জীবনের অভ্যন্তরেযে জীবন কুটিল আবর্তে প্রবাহিত তার স্রোতে 'শৃঙ্খল'-এর লেখকঅবতীর্ণ। গল্পের শেষে ভূপতি,বিনতির দাম্পত্য সম্পর্ককে প্রেমেন্দ্র মিত্র নির্ধারণ করেছেন ঃ 'তাহারাপরস্পরকে আর বুঝি ছাড়িতেও পারিবে না। প্রেম নয়, তাহার চেয়ে তীব্র, তাহার চেয়ে গভীরউন্মাদনাময় বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার শৃঙ্খলে তাহারা পরস্পরের সহিতআবদ্ধ। সে শৃঙ্খল তাঁহারা ছিঁড়িলে আরবাঁচিবার সম্বল কি রহিল--জীবনের কি আশ্রয় ? পরস্পরে জন্য তাহারা বাঁচিয়া থাকিতেও চায় '। কোনও বিশেষ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের এইপরিণতি যেমন মর্মান্তিক তেমনই ভয়ঙ্কর এবং ওই সম্পর্কের সম্বন্ধেএই অনুধাবনা নিঃসন্দেহে একটা দুঃসাহসী মনস্তাত্ত্বিক সাফল্য, জীবনের অতলেঅবতরণের দুঃসাহস যদি বা কোনও তত্ত্বজিজ্ঞাসুর হয় তবু কোনও দম্পতী-জীবনেরএই অন্তর্গূঢ় স্বরূপকে আলাপে ও আচরণে পরিস্ফুট করার জন্যেচাই অসাধারণ শিল্প-প্রতিভা এবং এ গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র সেইপ্রতিভারই পরিচয় দিয়েছেন। 'হয়তো' গল্পে অকুস্থলের রহস্যময় পরিমণ্ডলথেকে অর্থাৎ বহুলাংশে বুদ্ধি ও দৃষ্টি গ্রাহ্য সূত্র অবলম্বনে প্রেমেন্দ্রে মিত্রলাবন্য ও মহিমের অস্বাভাবিক সম্পর্ক কল্পনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তুশৃঙ্খলে লেখকের কোনও বাহ্য অবলম্বন নেই, এখানে তাঁর একমাত্র সম্বল মানবজীবনেরঅতলে অন্তর্ভেদী অনুভব ঃ প্রথমটি উদ্ভাবনে পরেরটি অনুধাবনে দুটিবিস্ময়কর শিল্পকীর্তি।

পৃথিবীরযে-দিকটা চারপ্রহর আলোকিত থাকে সে-দিকটার মতোই উল্টো দিকের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটাও সত্য আর মানব চরিত্রের সেই অদৃশ্য দিকেরঅস্তিত্বের কথা প্রকাশ করেই তিনি গল্পের ধারাকেঅপ্রত্যাশিত পথে চালনা করেন — তাঁর এই ছোটগল্পগুলিতেআছে লক্ষ্যের একাগ্রতার সঙ্গে অপ্রত্যাশিতের চমক। অথচ এমন নয় যে গল্পের শেষে চরিত্রেরনিজস্ব প্রকাশ-স্রোতকে ক্ষুণ্ণ করে তাকে আকস্মিকভাবেঅস্বাভাবিক পথে ঘুরিয়ে দেয় জোর করে। একই সঙ্গে পৃথিবীর সব দিক আলো পায় না এবং এইআলো-অন্ধকারের রহস্য যেমন সামগ্রিকভাবে তেমনই প্রাতিস্বিকভাবেমানুষের জীবনেও বর্তমান, তাই যখন লেখক একটি চরিত্রের রচনাতেপ্রকাশিত দিক থেকে তার অপ্রকাশিত দিকে দৃষ্টি আকর্ষণকরেন এবং একটা অব্যাহত অনিবর্যতার সঙ্গেই করেন, তখনই নতুন অভিজ্ঞতারউদ্দীপনে চমক সৃষ্টি হয়। মোপাসাঁ, ও হেনরি প্রমুখ পৃথিবীর অনেক বিখ্যাতছোটগল্পকারই কোনও একটা তথ্যকে পাঠকের দৃষ্টির আড়ালেযতক্ষণ রাখা সম্ভব ততক্ষণ রেখে শেষ মুহূর্তে ফাঁস করেঅভিপ্রেত চমক সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র শেষ মুহূর্তেআস্তিনের ফাঁক থেকে তাস বের করে পাঠককে তাক লাগাবাররীতিকে উচচাঙ্গের শিল্পকৌশল বলে মনে করেননি। একারণে অপ্রকাশিত দিকেরপ্রতি, অন্ধকারের প্রতি প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটা বিশেষপক্ষপাত আছে—তাঁর অধিকাংশ উৎকৃষ্ট ছোটগল্পেরইঘটনাকাল যে সন্ধ্যা বা রাত্রি বেলা এটা তাৎপর্যময়, তাঁর কাছে যেন জীবনেরপ্রকৃত স্বরূপ রহস্যময়, কুহকভরা, প্রত্যেক রজনীই যেন আরব্যরজনীর মতো রোমাঞ্চকর, 'একটি রাত্রি'র সুব্রতের মতো তারইমধ্যে আমাদের সত্তার জাগরণ, আবার তারই মধ্যে সহস্রাধিক দুই-এর সুনন্দেরমতো আমাদের সত্তার পতন, কিংবা 'কলকাতার আরব্য রজনী ঃ পয়লা চোরের কেচ্ছা'র নীলাম্বরের মতো সেখানেই আমরা স্বয়ং ভগবান হবারজন্যে প্রলুব্ধ চোরের সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু এটা স্পষ্ট করে বলাই দরক

ার যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পগুলিতে অপ্রত্যাশিতের অনবদ্য চমক থাকলেও আকস্মিকতার কোনও স্থান নেই।

পরিসমাপ্তির অনেক আগে থেকেই, এবং অধিকাংশ সময়ে পাঠকের অজ্ঞাতেই, প্রেমেন্দ্র মিত্র শুকরেন অন্তিম চমকের জন্যে সযত্ন প্রস্তুতি—শুতে টের পাওয়া ন াগেলেও গল্পশেষে চমকের আঘাতে সচেতন পাঠকের পশ্চাদ্দৃষ্টিক্ষেপে এটা ধরা পড়ে। 'সাগরসঙ্গমে' বা 'যাত্রাপথ'-এর মতো গল্পে প্রকাশ্যে আবার 'পান্থশালা' বা 'পলাতকা'র মতো গল্পে রহস্যের আবরণে এই প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' আর 'কুয়াশায়' বাংলা ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির অন্যতম—এ জ াতীয় গল্পের পরিণাম যেমন মর্মান্তিক তেমনই চমকপ্রদও কিন্তু সে পরিণামের মূলে বেগুন ও সরমার ব্যক্তিত্বের জটিলতার চাইতে তাদের স্ব-স্ব জাগতিক পরিস্থিতিই অধিক ক্রিয়াশীল, তাদের কাছে অন্য কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমস্ত পথই লুপ্ত হয়ে গেছল বলে তারা সম্পূর্ণ বাধ্য হয়ে নিপায় ভাবে আপন আপন পরিস্থিতির ক াছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং এখানে পরিস্থিতি আর পরিণাম শব্দ দুটি আসলে একই সত্ত্বের প্রার্থী। চরিত্রের নিপায় আত্মসমর্পণের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র অভীষ্ট চমক সৃষ্টিতে সমর্থ। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী চরিত্র কেউ পস্থাপন করে প্রেমেন্দ্রে মিত্র দেখেছেন তাতে মানুষের কোন কোন স্বভাব ও স্ব রূপ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ এটাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপলব্ধি যে মানুষের মানে জানতে হলে, তার যথার্থ স্বভাব ও স্বরূপকে জানতে হলে তাকে ফেলতে হবে একটা কে ানও চূড়ান্ত পরীক্ষায়, যেটাকে অক্ষরার্থে না হলেও ভাবার্থে বলা যায়, জীবনমৃত্যুর পরীক্ষা। তাঁর 'নীলকণ্ঠ' নামক কবিতাটি এখানে স্মরণীয় যার শেষে তিনি মন্ত্রের মতো উচচারণ করেছেন, 'মৃত্যু জীবনের শেষ সার আবিষ্কার আর শিব নীলকণ্ঠ'।

জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষায় নীলকণ্ঠের মতো কেউ উত্তীর্ণ হয়, কেউ পরাস্ত হয়। দার্শনিকের দুরকমই হবার কথা, কিন্তু মর্মী শিল্পীর কাছে সফল আর বিফল দুজনেই সম ান। আর কে যে সফল কে-ই বা বিফল তার বিচার করার শক্তি কি মানুষের সবসময় থাকে ! 'পলাতকা'র কমল, বাসব আর রমা তিনজনই গল্পের শেষে ভবিতব্যের বা জীবনবঞ্চনার একই পৈঠায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের এই সমান অবস্থার কথা স্পষ্ট হয়েছে রমা সম্বন্ধে কমলের উক্তিতে ঃ 'আমরা কেউ তাকে চিনিনি। সে নিজেও নিজেকে চেনেনি এই হ'ল আমাদের সকলের সমস্তদুঃখের মূল। নিজেও সে তাই সুখী হয়নি, কাউকে সুখী করতেও পারেনি।' পক্ষান্তরে বাসবের মনে হয়েছে 'হয়তো সমস্ত কথাই কমলের বানানো। হয়তো রমার মৃত্যুর জন্যে সে-ই দায়ী। তবু তারার আলোয় অস্পষ্ট উদাস এই প্রান্তরের মাঝে দাঁড়িয়ে কথাগুলো কেমন বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হয়।' সামান্য মানুষ নিজেকে অল্পই জানে, অল্পই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, ঘটনাপ্রবাহকে অল্পই চালনা করতে পারে, পুষাকারে ত াদের অল্পই অধিকার থাকে, এমন কী নিজের গভীরে পরাভবকেও অল্পই ধারণা করতে পারে।

'থার্মোফ্লাস্কও চীনের যুদ্ধ' গল্পটি এমনই এক মর্মান্তিক পরিণতির কাহিনী, কিন্তু তার নায়ক প্রশান্ত এই পরিণতিকে স্বীকার করে নিতে পারেনি বা নিশ্চিতভাবে জানতে পারেনি, ফলে তার ব্যর্থতা দ্বিগুণ তীব্র হয়ে উঠেছে। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে ১৯৩৮-এ রচিত এ-রচনাটি শিল্পকৌশলে একটি অতুলনীয় ছোটগল্প। প্রশ ান্তর চেতনাপ্রবাহে সমগ্র কাহিনীটির বিস্তার হয়েছে চোখের সামনে তাকের উপরে রাখা একটি পুরানো রংচটা তোবড়ানো থার্মোফ্লাস্ক ও চায়ের টেবিলে রাখা দৈনিক পত্রিকায় চীনের উপরে জাপানের বর্বর আক্রমণের বিবরণের সূত্র ধরে—যেখানেই প্রশান্তের চেতনা নিষ্ক্রিয় হতে চেয়েছে সেখানেই এই দুটি সূত্রের কোন একটি তাকে আবার স্মৃতিচারণে প্রণোদিত করেছে। 'থার্মোফ্লাস্ক ও চীনের যুদ্ধ' গল্পটি সূত্র ও স্মৃতির মধ্যে অত্যন্ত অনায়াস ও সাবলীল পর্যায়ক্রমিক প্রসরণের এক বিস্ময়কর নিদর্শন। প্রেমেন্দ্রমিত্রের রচনার একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো কঠোর বাকসংযম ও ভাবপ্রবণতার আমূল বর্জন, প্রত্যেকটি শব্দ ও বর্ণনার নিখুঁত যথাযথ বিন্যাস, প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গান্তরের মধ্যে অমোঘ শৃঙ্খলা বিধান, যেন এক-একটি ছোটগল্পে এক -একটি মহাকাব্যকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা আছে, তাই তাঁর উৎকৃষ্ট ছোটগল্পগুলিতে পাঠক বা লেখক কারও পক্ষে ইকণামাত্র ক্লান্তি বা শৈথিল্যের প্রশ্রয় নেই, সেগুলি প্রতিমুহূর্তের জন্যে পরিশ্রমী, সজাগ, সতর্ক ও সন্ধানী অভিনিবেশ দাবি করে। 'থার্মোফ্লাস্ক ও চীনের যুদ্ধ,' 'জ্বর' প্রভৃতি গল্প এজাতীয় গল্পের একটি সার্থক উদাহরণ।

গল্পটি শুহয়েছে প্রশান্তর ঘুম থেকে জেগে ওঠার উল্লেখে। কিন্তু তারপরে গল্প যেভাবে এগিয়েছে তার বিশ্লেষণের আগে 'অফুরন্ত' গল্পটির কথা বলি। ছোটগল্প ক াকে বলা যায় সে সম্বন্ধে 'অফুরন্ত'-এর শুতে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন, 'গল্প চলে বহুবর্ণ স্রোতের মতো অবিশ্রান্ত বয়ে, তার মাঝের খানিকটা ধরিমাত্র,—এই ঘাট থেকে আর এক ঘাট। ব্যাস, এই পর্যন্ত'। সাধারণ ভাবে ছোটগেল্পর শু ছোটগল্পের শু ও সারা সম্বন্ধেএই মন্তব্য আপত্তিকর নয়। কিন্তুএই মন্তব্যের নিদর্শন দিতে গিয়ে

তিনি 'অফুরন্ত'গল্পটি শু করেছেন এভাবে ঃ 'বনমালী ঘোষ পুরনো রঙচটা দোশালাটিগায়ে দিয়ে ভাঙা দেউড়ি দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়— এই ধরোগল্পের অ ারম্ভ'। আপাত চোখেঅত্যন্ত নিরীহ ও নিস্তাপ এই বর্ণনাকে বিশ্লেষণ করা যায়। দোশালা গায়ে দিয়েছে যখন তখন বনমালীঘোষকে বিত্তবান বলেই মনে হয়, আর বিশেষ উপলক্ষ ছাড়াই যে-ব্যক্তিদোশালা গায়ে দেয় সে নিশ্চিত বিশেষ বিত্তবান, কিন্তু দোশালাটি পুরনো ওরংচটা, সুতরাং অনুমান হয় যে বনমালী ঘোষের বিশেষ বিত্ত টা বর্তমানেরনয়, অতীতের, এবং অনুমান দৃঢ় হয়দেউড়িটা ভাঙা জানার পরে। তারমানে বনমালী ঘোষের বংশ একদা বিশেষ বিত্তবান ছিল, এখন ত ার পতিত দশা, সঙ্গেসঙ্গে গড়ে ওঠে বাংলার এক প্রাচীন বিত্তবান বংশের পতনের দীর্ঘ কাহিনী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই ঘাট থেকেআর এক ঘাটে যাওয়ার কা হিনী নিয়েই ছোটগল্প বলা সত্ত্বেও প্রেমেন্দ্র মিত্রনিজে কিন্তু যে কোন ঘাট থেকে আর এক যে-কোনও ঘাটে যেতে রাজি নন। এমন ঘাট থেকেই তিনি যাত্রা শু করেন যেখানথেকে স্রোত একটা বাঁক নিয়েছে এবং যে-বাঁক থেকে পেছনে উৎসের দিকেবহুদূর দেখা যায় এবং তাঁর প্রতিটি সার্থক গল্পের সমাপ্তি বিশ্লেষণেই বোঝা যাবে যে এমন ঘাটেই তিনি যাত্রা সারা করেন যেখান থেকে সামনে মোহানারদিকেও বহুদূর দেখা যায়।

'থার্মোফ্লাস্কও চীনের যুদ্ধে'র প্রসঙ্গে 'অফুরন্ত'র প্রসঙ্গটেনে আনার কারণ হলো একথাটাই বোঝানো যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প শুথেকেই সাবধানে আস্তে আস্তে বুঝে বুঝে পড়া দরকার। প্রশান্তর গল্পকে তিনি অন্যকোনওখান থেকে শু না করে তার ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরেই শু করেছেন,'সদ্য ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর চেতনা যখন ধীরে ধীরে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে যেতেথাকে তখনকার অবস্থাটা প্রশান্তর কাছে বিশেষ উপভোগ্যজিনিস'। কেন উপভোগ্য ? 'বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজেকে যেন সেআবিষ্কার করতে থাকে সবিস্ময়ে— এক এক করে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তারপর অত্যন্ত কাছের আবেষ্টন, তারপর আরওজটিল, আরও বহুদূর প্রসারিত, বহু স ম্পর্কে জড়িত সত্তা।' এখানেপ্রশান্তের ঘুম শুধু স্নায়বিক প্রক্রিয়ার একটা বিশেষঅবস্থা নয়, তা চৈতন্যের নিষ্ক্রিয় বা সত্তার বিস্মৃত অবস্থাও বটে,এবং এই ঘুম ভাঙা ম ানেই বিস্মৃতি থেকে ঘটমান বর্তমানে প্রত্যাবর্ত্তনতথা চেতনার সেই প্রক্রিয়ার শামিল হওয়া যাতে মানুষ আপনঅস্তিত্বের স্বরূপ জিজ্ঞাসায় আক্রান্ত হয়। এরপরেই ঘটমান বর্তমান থেকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়সাধারণ অতীতের অনুষঙ্গে ঃ ঘাড় ফিরিয়ে এতক্ষণ সে শেলফের উপরচটা -ওঠা তোবড়ানো থার্মোফ্লাস্কটার দিকে চেয়ে ছিল বুঝে সে নিজেইঅবাক হয়ে যায়। সেদিন পর্যন্তএরকম তো সে কখনও করেনি। চোখগিয়ে পড়লেও সে ইচ্ছে করে ফিরিয়ে নিয়েছে। মনের এদিকের কপাট সে সযত্নে রেখেছে বন্ধ করে—প্লাবনের জল রুদ্ধ করে রাখবার জন্যে এ যেন তার অবচেতন মনের বাঁধ। কিন্তু আজ হঠাৎ কী হল ? এরপর স্বভাবতই থার্মোফ্লাস্কটার সঙ্গেপ্রশান্তর জীবনের সম্পর্কটা জানার জন্যে পাঠকের কৌতূহল জাগে। সে-কৌতূহলকে নিবৃত্ত না করে সাধারণঅতীত থেকে ফিরে এসেছেন নিত্যবৃত্ত বর্তমানে। 'বিছানার ধারে টিপয়ে চাকরে চা রেখে গেছে। তারই সঙ্গে খবরের কাগজ। চীনের ওপর জাপানের অত্যাচার সম্বন্ধেছাপার হরফের তীব্র আর্তনাদ সেখানে সমস্ত কাগজটার ওপর এমনভাবেবিস্তৃত যে লক্ষ না করে উপায় নেই।'

তাস ফেলেদেওয়ার মতো কাহিনীর হেতুসূত্র দুটোকে পাঠকের সামনে শুতেই দেখিয়েদিয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, ওই সূত্র দুটোর বেশি কোনও তৃতীয় সূত্র অর্থাৎপ্রশ ান্তর আত্মচিন্তার অন্য কোনও উৎসকে গোপন রাখেননিযেটাকে গল্পের শেষে আকস্মিকভাবে উত্থাপন করে কোনওঅপ্রত্যাশিতের চমক দিতে পারেন। তারপর থ ার্মোফ্লাস্ক ও চীনের যুদ্ধের প্রসঙ্গ থেকেপর্যায়ক্রমে খুব হিসেব করে করে প্রশান্ত, মায়া আর অণেরকাহিনীকে প্রশান্তের চেতনায় ধীর ও দৃঢ়ভাবে গড়ে তুলেছেন। টিপয়ের উপর চাকরের রেখেযাওয়া চা নিঃশেষ করতে করতে খবরের কাগজটা পড়ার জন্যে যতটুকু সময়লাগে ঠিক তার মধ্যেই কাহিনীর নির্মাণকর্ম স ম্পূর্ণ। প্রশান্ত বারবার তার সম্বন্ধে মায়ার প্রকৃতমনোভাবকে জানার চেষ্টা করেছিল, জানতে চেয়েছিল তার ভালোবাসারবদলে মায়ার ভালোবাসা সে পেয়েছে কিনা। কিন্তু তা জানতে পারার আগেই 'নিষ্ঠুর যবনিকা এলনেমে, তবু উত্তর মিলল না রক্তাক্ত হৃদয়ের ব্যাকুলপ্রশ্নের—বিষাক্ত কীটের মতো যা তার বুক ভেদকরেবেরিয়েছে। মায়া অনেকদিন থেকেইনিজেকে সরিয়ে রেখেছিল, এবারে সরে গেল একেবারে, সমস্ত জিজ্ঞাসারবাইরে, যেন সাগ্রহে স্বেচ্ছায়।' একা প্রশ ান্তের সংসার থেকে নয়, অণের সংসর্গ থেকেওনিজেকে মায়া দূরে সরিয়ে রেখেছিল এবং অণের সঙ্গে প্রশান্তেরযোগাযোগ হলেও মায়ার সঙ্গে দেখা করার অ াগ্রহও অণের মধ্যে দেখতে পায়নিপ্রশান্ত। তিনজনের পারস্পরিকসম্পর্কের মধ্যে কোথাও উগ্র বা স্পষ্ট আগ্রহ বা বিরাগ কোনওটাই ছিল না,অথচ তিন জনেই ত াদের সম্পর্কের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর অসঙ্গতি, বাহ্যনৈকট্য সত্ত্বেও একটা অনতিক্রম্য ব্যবধানকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে, তার দনতাদের কথোপকথনে মধ্যে মধ্যে

বাদের গন্ধ পাওয়া গেছে। মায়ার মৃত্যুর আগের মুহূর্তেওপ্রশান্ত সেই বাদে আগুন দিয়ে সব আবরণকে দীর্ণ করে সত্যকেস্পষ্ট ভাবে জানার চেষ্টায় মিথ্যে করে বলেছে, 'মায়া, অণবাবুএসেছেন দেখতে, অণ...' তার পরেও নিষ্ঠুর নেশায় মেতেমৃত্যুপথযাত্রিণীকে প্রশান্ত জিজ্ঞেস করেছে, 'তাঁকেডাকব?' কিন্তু মায়ার চেতনারব াদে আগুন ধরল না, কারণ সে তখন আবার তলিয়ে গেছে অচেতনতায়,হারিয়ে ফেলেছে কথা বলার ক্ষমতা। 'হঠাৎ আচ্ছন্নতার ভেতরে নিজে থেকেই সে বলেউঠল—আমায় তুমি ভুল বুঝো না। আমি তোমাকে দুঃখ দিতে চাইনি .....। চেতনার শেষ স্ফুলিঙ্গ অন্ধকারকে চমকিতকরেই মিলিয়ে গেল। কাকে বলছ মায়া ? কাকে ? — প্রশান্তর আর্তকণ্ঠ ঘরের বাইরের থেকেও বুঝিশোনা গেল। তখন অনন্ত স্তব্ধতানেমেছে।' গল্পটি এখানেইউত্তরহীন প্রশ্ন শেষ হতে পারত, পাঠকের জন্যেও উত্তর অনুমানেরঅবকাশ থাকত। কিন্তু প্রেমেন্দ্রমিত্র এখানে কোনও ব্যক্তিগত বা কালচিহ্ন ব্যর্থ প্রেমের বোধকে রূপ দিতেচাননি, সেই রূপের ব্যঞ্জনায় এক গভীরতর ও ব্যাপকতর সত্যকে, যে সত্য প্রতিবোধবিদিত,যে-সত্য শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং তাকেই এখানে সহৃদয় হৃদয়সংবাদী অর্থধ্বনিতে উচ্চারণকরেছেন ঃ গল্পটিতে চীনেরযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার বিশদ বিবরণের শেষে তিনি যোগ করেছেন দুটি মাত্রবাক্যঃ 'জীবনের দেবতার এরকম পাইকিরি ট্র্যাজিডির কারবার এইপ্রথম নয়। যুগে যুগে পৃথিবীরছড়ানো ধ্বংসস্তূপের আবর্জনায় একটা রঙচটা টোলখাওয়া থার্মোফ্লাস্ক,আর একটা বুকচেরা প্রশ্ন।'

প্রশান্তও মায়ার সম্পর্কের মধ্যে ব্যবহারিক নৈকট্য সত্ত্বেও মনস্তাত্ত্বিকযে-বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম হয়েছিল তার মূল বিস্তৃত ছি ল অণ ও মায়ারসম্পর্কে। প্রেমের বা ঞ্ছিতপরিণাম হিসেবে অণ ও মায়ার মিলন হয়নি। তাদের মিলনের পথে কোন বাধা ছিলতা স্পষ্ট করে বলা হয়নি— হয়তো তাদের মধ্যে অর্থনৈতিকস্তরের ব্যবধান ছিল, কিংবা ছিল পারিবারিক মর্যাদার বা বর্ণগোত্রইত্যাদির বাধা কিন্তু অণ ও মায়ার মিলনে বাধা যা-ই থাকুক সেজন্যেপ্রশান্তের কণামাত্র দায়িত্ব ছিল না, অথচ অণ ও মায়ার প্রেমেরব্যর্থতা প্রশান্তের দাম্পত্য জীবনকেও ব্যর্থ করে দিল।

বিবাহপূর্বপ্রণয় থেকে উদ্ভূত বিবাহোত্তর জীবনের জটিলতা প্রেমেন্দ্র মিত্রেরএকটি প্রিয় প্রসঙ্গ এবং সামাজিক বা পারিবারিক বাধাকে ভেঙেপ্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের নজির প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনাতেবিরল, আরও লক্ষণীয় যে অপরিণত বয়সের সরলচিত্ত নায়ক-নায়িকার আবেগেঅন্ধ উচ্ছ্বসিত বিবেচনাহীন প্রণয়ের উপাখ্যান রচন াতেও তিনি বিমুখ। পরিপার্শ্বের উত্তাপে পরিপক্ক,ঔপনিবেশিক বা অনগ্রসর দেশের আধা-মধ্যযুগীয় আধা-আধুনিক নিয়মবিচার ওরীতিনীতির জালে আবদ্ধ যে চরিত্র অর্থাৎ যার ব্যক্তিত্বে শ্রেণী-সত্ত াপ্রকটরূপ লাভ করেছে তার অনিবার্য জটিলতা, দ্বিধাগ্রস্ততা ও সমস্যার স্বরূপঅন্বেষণেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের সর্বাধিক আগ্রহ।

'জনৈককাপুষের কাহিনি'তে এই সমস্যা একটা দাণ নাটকীয়পরিস্থিতিতে বিবৃত। গল্পেরনায়ক ও কণার বিচ্ছেদের মূলে কণার পরিবারের মর্যাদার প্রশ্ননিহিত ছিল, সে মর্যাদাকে পেছনে ফেলে কণা এসেছিল প্রেমিকের কাছেআশ্রয়ের জন্যে, কিন্তু নায়কের তখন নিজেরই আর্থিক ভরসা সামান্য, সে সাহসপায়নি কণাকে আশ্রয় দেওয়ার। পরেযখন তাদের অকস্মাৎ দেখা হলো তখন দুজনেই নিজের নিজের জীবনেপ্রতিষ্ঠিত এবং নায়ক তখন তার পূর্ব-অক্ষমতারপ্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে উৎসুক— কণার মনে সে জাগাতে চেয়েছেপ্রথম প্রেমের উন্মাদনা। এবার কণা তাকে নিরস্ত করে,কেননা বিমলবাবুর সংসারে সেআশ্রিতা নয়, স্বামিনী। অভিমানে নায়কযখন অকালে বিমল-কণার আতিথ্য অস্বীকার করে বিদায় নেয় তখন সহসা কণা এসেআবার তার সঙ্গে নোঙর ভাসিয়ে বেরিয়ে পড়তে চায়। নায়ক কোথায় উল্লসিত হবে, তা নয়, সেবলে, 'কিন্তু সব কথা তুমি বোধ হয় ভালো করে ভেবে দেখোনি কণা। যে ঝড় এবার উঠবে তা কি তুমি পারবেসইতে ? তার সঙ্গে যুঝতে যুঝতেক্লান্ত হয়ে হয়তো আমরা পরস্পরকেই একদিন ঘৃণা করতে শুকরব।' তার এই উপদেশ যেঅত্যন্ত মূল্যবান ও সুবিবেচনাপ্রসূত একথা সহজেই বোঝা যায়, কিন্তুএটাও অনস্বীকার্য যে এর মধ্যে আছে নিপাট কাপুষের ভণ্ডামিও এবং সেটাইপ্রায় সবখানিই । আসলে এইভণ্ডামি এই কাপুষতা আধুনিক বলে কথিত সম াজব্যবস্থার অন্তর্গতখণ্ডিত দুর্বল অসমর্থ ব্যক্তিস্বরূপেরই সুসংহত ও সার্থক ভাষ্য।

'একটিরাত্রি' গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র বিংশ শতাব্দীর মানুষ হিসেবে বলেছেন,'এ যুগে আমরা সবাই অল্পবিস্তর অভিশপ্ত, পতিত। আমাদের বিবর্ণ জীবনে মৃত্যুর হিমস্পর্শ লেগেছে। আমাদের আকাশ শূন্য হয়ে গেছে, পৃথিবীযান্ত্রিক প্রাত্যহিকতায় কঠিন'। গল্পটির নায়ক সুব্রতের বাইরের নয়, ভেতরের পরিচয়অর্থাৎ ব্যক্তিস্বরূপেরই পরিচয় দিয়েছেন লেখক। 'সে ক্লান্ত—আত্মার দুঃসহ ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। আশা, আদর্শ, প্রেরণার ভগ্নস্তূপের মধ্যে সে বাসকরছে। প্রতিদিনের সূর্যোদয়কেসাগ্রহে অভিনন্দিত করবার উৎসাহ তার মধ্যে নেই।' তার মনে আশা, আদর্শ, প্রেরণা একদানবীন মানুষের মতোই ছিল, আজ সেসব ধূলিসাৎ, আজ তার সত্তা এতদূর

দেউলে যেসূর্যোদয়ের মতো উদ্দীপক ঘটনাও তার কাছে অর্থহীন, জীবন তার কাছে শুধুঅনর্থক অস্তিত্বের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি। এখানে লেখক সুব্রতের পরিচয় দেওয়ার ছলে একালের বিশিষ্টআশুচেতন প্রাতিস্বিকের অমোঘ অবস্থাগুলিকে সূচিবদ্ধ করেছেন। এই সুব্রতের সঙ্গে তারপূর্ব-প্রণয়িনী মীরার অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হয়ে য ায় কলকাতারপথে। 'সাক্ষাৎ নয়, দুটিসত্তার সঙ্গে সে বুঝি সংঘর্ষ। অন্ধকারআকাশের মৃত তারকাপিণ্ডও উঠেছে বহ্নিদীপ্ত হয়ে সে সংঘর্ষে।' এই সাক্ষাতের ফলে তার পতিত আত্মাগভীর জড়ত্ব থেকে জেগে উঠেছে। পরদিন সকালে সুব্রত সংকল্প করেছে মীরার সঙ্গেসাক্ষাতের উন্মাদনাকে অক্ষয় করে রাখবে তার জীবনে। অতঃপর গল্পটি শেষ করেছেন, 'মানুষেরদুর্বলতার অন্ত নেই জানি, তবু সুব্রতের এই সংকল্পটুকু জেনেইআমরা বিদায় নিলাম।'

সুব্রতেরসংকল্প রক্ষিত হবে কি হবে না এ-সম্বন্ধেসংশয়ে গল্পের সমাপ্তি দেখেঅনুমান করা যায় যে 'জনৈক কাপুষের কাহিনী'র নায়কের মতোইসুব্রতও ওই সংকল্প রক্ষায় অক্ষম—দুর্বল। বিংশ শতাব্দীর মানুষ কোনও সাক্ষাতে সহসা উদ্দীপিত হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু তার সে উদ্দীপনাহয় না, বরং বাস্তবের প্রতিস্পর্ধার মুখোমুখি হলে কাপুষের মতোপশ্চাদপসরণই করে, যেখানে সে শুধু অভ্যাসের দাস। প্রেমের এই কৃশ পরিসমাপ্তির কাহিনী'ভস্মশেষ'। 'একদিন একটি ছেলে সমস্ত পৃথিবীর বিদ্ধেপরম দুঃসাহসভরে দাঁড়াতে দ্বিধা করেনি।' কিন্তু অমরেশের আহ্বানে সাড়া দিতে দ্বিধা করেছিল সুরমা, সেসময় চেয়ে নিয়েছিল অমরেশের কাছে। 'অমরেশ ডাক্তার অপেক্ষা করেছে—কিছু দিন, অনেকদিন, বড়ো বেশি দিন অপেক্ষা করেছে'। তার ফল কী হয়েছে ? 'ধীরে ধীরে কখন আগুন গিয়েছে নিবে। কখন আর-বছরের পাপড়ির মতো সে ম্লানশুকনো বিবর্ণ হয়ে গেছে— তারা সবাই বিবর্ণ হয়ে গেছে। বিবর্ণ আর সুলভ আর সাধারণ। অভ্যাসের ছাঁচে তারা বদ্ধ হয়ে গেছেসংসারের ধূলায়'। এই হলোবর্তমান ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত জীবনের স্বরূপ। দশ বছর আগে, ১৯২৮ সালে লেখা 'পুতু ল ওপ্রতিমা'র অন্তর্গত 'লজ্জা' গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্রবলেছেন, 'দেবতার মহত্ত্ব মানুষের নাই, মানুষ পিশাচের মতোনিষ্ঠুরও নয়, মানুষ শুধু নির্বোধ।' মানুষের এই পরিচয় ক্রমশই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছে ব্য াপক ওজটিল হতে থাকল, তার বহু স্তর ও মাত্রা ধরা পড়তে থাকল, মানুষ মানেতাঁর কাছে কোনও নিরাকার ভাবসত্ত্ব নয়, তার একটা স্পষ্ট বহু মুখেবিকাশশীল স ামাজিক মূর্ত রূপ আছে।

লক্ষণীয় যেপ্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে উচচশ্রেণীর মানুষ অনুপস্থিত, যেন ওইশ্রেণীকে তাৎপর্যহীন বলে অগ্রাহ্য করে গেছেন, এবং 'হয়তো' বা'অফুরন্ত'-এর মতো গল্পে যদি বা সামন্ততান্ত্রিকসমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন তবু সেখানেও তাঁর দৃষ্টিবৈজ্ঞানিকের—ঐতিহাসিকের, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ক্ষয়ও ক্ষয়জনিত বিকৃতির দিকে। এর মধ্যে 'অফুরন্ত'লেখকের গভীর কালচেতনার সাক্ষ্যবাহী ঃ এক সমাজব্যবস্থার ভিতরথেকে আর এক সমাজব্যবস্থার, প্রাচীন প্রজন্মের থেকে নবীনপ্রজন্মের দীর্ঘকালব্যাপী বিবর্তনের কাহিনি ছোটগল্পের সংকীর্ণ পরিসরে পেয়েছে অসাধারণ ঘনসন্নিবদ্ধ কঠিনরূপ। নবীন প্রজন্মেরমীমাংসায় লেখক বলেছেন, 'একই খাতে বয়ে, বহু যুগান্ত পার হয়ে এধারা ক্লান্ত হয়ে পড়েনি। এস্রোত হয়তো ঘোলাটে, হয়তো অনির্মল, কিন্তু প্রবল, বেগবান। হিংস্র পৃথিবীর লেলিহান ক্ষুধ ার বিদ্ধে এস্রোত সংগ্রাম করে টিকে থাকতে পারবে।' মহাকাব্যের উপযুক্ত কাহিনিকে তিনি চুম্বকে ধারণ করেছেন। তার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ওসম্ভাবনাময় প্রটিকে নিবিড় ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করে। যেমন একালের প্রধান শক্তিরপ্রকৃতি নিরূপণে তেমনই নবীন প্রজন্মের সংগ্রামেরপ্রকৃতি নির্ধারণে লেখকের বিচারের যথার্থ্য বিস্ময়কর।

স্বচ্ছন্দে নয়,প্রতিকূলতার বিদ্ধে নিরন্তর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকেথাকাটাই সামন্ততান্ত্রিক প্রথা বিলুপ্ত হবার পরে ধনতান্ত্রিকপৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা এবং এই সমস্যা উচচ ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর চাইতেমধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে এত বড়ো যে তাকে সংকট আখ্যা দিতে হয়। এই সংকটের একটা বিশিষ্ট দিক হলোমূল্য বোধোর বিপর্যয়। 'চুরি' গল্পটি মূল্যবোধের বিপর্যয় কেমন করেমধ্যবিত্ত জীবনকে আস্তে আস্তে গ্লাবিত করছে তার অনবদ্যবিশ্লেষণ। আদর্শবাদী সত্যনিষ্ঠ প্যারীমোহনবাবুপান-বিড়ির দোকানীর কাছে তাচ্ছিল্যের আর তাঁর প্রাক্তন ছাত্রের কাছেঅপমানের পরেও থেকে গেছেন একই মানুষ—শুধু বাইরের এসব তাচ্ছিল্য ওঅপমান তিনি সহ্য করেছেন গভীর মর্মবেদনায়, কিন্তু যখন দেখলেন পরিপার্শ্বনীতিহীনতা তাঁর পরিবারের মধ্যেও প্রবিষ্ট তখন ব্যর্থতায় হতাশায়গ্লানিতে তাঁর সমস্ত দেহ-মন একেবারে অসাড় অবশ হয়ে গেল। লেখক এখানে কোনও যুগসত্যের পক্ষঅবলম্বন করেননি, গল্পের শেষে কোনও গূঢ় ইঙ্গিতময় মন্তব্য করেননি,কোনও মূল্যবিচ ারের প্রকেও উত্থাপন করেননি, শুধু দ্বিতীয়মহাযুদ্ধের কালে এক প্রজন্মের কাছে অপর প্রজন্মেরমর্মান্তিক পরাজয় কাহিনীকে বাস্তবের প্রতি সার্বভৌমআনুগত্যে প্রক

াশ করেছেন, কিন্তু গল্পটিতে বাস্তবের ছোট ছোটকতগুলি বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে প্যারীমোহনবাবুর চরিত্রে বৈশিষ্ট্য-সূত্রে যেভাবে পারস্পরিক সামঞ্জস্যে গেঁথেছেন তাতেই নিশ্চিত ভাবেপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে লেখকের অনন্য শিল্পীত্ব। আবার সাম্প্রতিক মূল্যবোধের বিচার একআশ্চর্য শিল্পরূপ পেয়েছে 'জ্বর' গল্পটিতে। শারীরিক বিচারের প্রসঙ্গেইগল্পের শু ঃ 'সন্ধ্যে সাতটায় কম্প দিয়ে জ্বর এল। লেপ কাঁথা যেখানে যাছিল চাপা দিয়েও সে কাঁপুনি থামানো যায় না।' দুটি বাক্যের পরেই এই বিক ারেরদেহাতীত সত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত এসেছে, 'একটা প্রচণ্ডউন্মত্ত আলোড়ন শুধু যেন শরীর নয়, সমগ্র সত্তার অন্তস্তল থেকেউদ্দাম হিমশীতল তরঙ্গের পর তরঙ্গ সমস্ত চেতনা ক্ষণে ক্ষণেআমাকে আঘাতে জর্জরিত প্লাবিত করে দিয়ে যাচ্ছে।' এখানেই ক্ষান্ত হননি লেখক, কোনবিশেষ প্রকরণে গল্পটি পরিবেশিত হতে যাচ্ছে তারও অ াভাস লেখকদিয়ে রেখেছেন পরের বাক্য তিনটিতে ঃ 'এক মুহূর্তে সব কিছু গেল বদলে। কোন ধারাবাহিকতা আর নেইচেতনার। জীবনের একটি নিটোলচমৎকার দিন যেন টুকরো টুকরোহয়ে, ভেঙে ছড়িয়ে, এলোমেলো হযে যাচ্ছে, মিশে'। পুরনো প্রেমিকার সঙ্গে দীর্ঘকাল পরেদেখা হওয়ার সুযোগে তার হাতব্যাগ থেকে ট াকা সরিয়ে নেওয়ার এইকাহিনিতে একদিকে যেমন মনুষ্যত্বের চরম বিকার উপস্থাপন করা হয়েছেতেমনই সে উপস্থাপনের প্রক্রিয়াও একান্তরূপে বিষয়েরঅনুসরণে আগাগোড়া সুসংগত অর্থাৎ গল্পটি উক্তি ও উপলব্ধির সিদ্ধ সংযোগেনিষ্পন্ন।

বিংশ শতাব্দীরমানুষ যন্ত্রসভ্যতার চাপে শুধুই বিকৃত ও যান্ত্রিক হয়ে যায়নি, ধনতান্ত্রিকব্যবস্থায় বৈষয়িক সাফল্যকেই একমাত্র সাধ্য লক্ষ্য বলে মানতে শিখেছে এবংএজন্যে মূল্য হিসেবে তার সবকিছুই সমর্পণে প্রস্তুত, ওইসাফল্য-নিরপেক্ষ কোনও একাগ্রতা ও তন্নিষ্ঠা তার কাছে অজ্ঞাতবস্তু। ক্ষণিকের জন্যে বিত্তের অতীতকে ানও সত্যের উদ্ভাসন কারও কারও জীবনের বিরল কোনও মুহূর্তে ঘটতেপারে কিন্তু তাকে অক্ষয় করা দূরে থাক, দীর্ঘকাল ধারণ করে রাখারশক্তিও এই সম াজব্যবস্থায় নিঃশেষে ক্ষয় হয়ে গেছে। আপাত দৃষ্টিতে একালের মানুষকেঅস্থির ও চঞ্চল মনে হলেও তা আর মানুষের নিজস্ব প্রাণপ্রৈতিকিংবা তার স্বাশ্রয়ী চরিত্র থেকে উৎসারিত নয়, সে অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যআসলে পুঁজি ও মুনাফার চাকায় বাঁধা অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যের অংশমাত্র। তাই তেলেনাপোতায় দেখা সেই মেয়েটিকেমহানগরের জনাকীর্ণ আলোকোজ্জ্বল রাজপথে এসে মনে হয় 'কোনো দূর্বলমুহূর্তের অবাস্তব কুয়াশাময় কল্পনা মাত্র'। যে-অনুভাবে 'একটি রাত্রি'র ন ায়কসুব্রত উদ্বুদ্ধ হয় তার বাস্তব উৎস শুকিয়ে গেছে এবং একারণেই তেলেনাপোতা আবিষ্কারও একটা আকস্মিক ও সাময়িক ঘটনা। এরূপ উদ্বোধন সম্বন্ধে তাই প্রেমেন্দ্র মিত্রবলেছেন, 'একবার ক্ষণিকের জন্যে আবিষ্কৃত হ'য়ে তেলেনাপোতাআবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যাবে।' গল্পটির ক্রিয়াপদগুলো সাধ ারণভবিষ্যৎ কালে প্রযুক্ত হয়েছে— এটা গল্প বলার কৌশলকে শুধুঅভিনবত্বই দান করেনি —গল্পের তাৎপর্যকে সাধারণীকৃত ভবিষ্যদ্বাণীরঅমোঘতা ও রোমাঞ্চ দ ান করেছে।

শুধু নিজেরবৈষয়িক বা সামাজিক অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কিছুকে, অন্য কোনও প্রেমস্বপ্ন বা সংকল্পকে, জীবনের কোনও গূঢ়তর সত্যকে, সত্তার কোনওপ্রগাঢ় বোধ বা জগরণকে টিকিয়ে রাখার সাধ থাকলেও সাধ্য নেই একালেরমানুষের। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পগুলিতে পুনঃপুনঃ প্রতিধবনিত উক্ত মীমাংসা মধ্যবিত্ত শ্রেণীরপক্ষে অ াদৌ প্রীতিকর নয়। তাঁর রচনায় এই শ্রেণী নিজের যে-পরিচয় জানতে পায় সে-পরিচয় তার অভিমানকে আহত করে, তাই সে-পরিচয়কে মনে মনে নাপারলেও মুখে অস্বীকার করতেই চায়। 'রবিনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন' গল্পটির নায়িকা নানসু-র মতো নিজের অলীক আত্মতৃপ্তি ও আত্ম বঞ্চিত কল্পনার জগতেই মধ্যবিত্তের বেঁচে থাকা, নিজের প্রকৃত পরিচয় জানলেই তার বাঁচা মিথ্যে হয়েযায়। এই শ্রেণীর মনোরঞ্জন করারপ্রয়াস নেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনায়, নেই এর আত্মাভিমানীকল্পিত পৃথিবীর প্রতি ধূর্ত প্রশ্রয়, যা আছে তা হলো অকপটঅনুকম্পার সঙ্গে এ শ্রেণীর ব্যক্তিস্বরূপের মর্মভেদী বিশ্লেষণ—এই ব্যক্তিস্বরূপনির্বোধ, ক্ষুদ্র, ভী কাপুষ, ভণ্ড, কীলকবদ্ধ, অস্থিরমতি,প্রতারক, দ্বিধাগ্রস্ত, খণ্ডিত, দুর্বল, বিধবস্ত, পরাজিত, তবুহ্রদের প্রশান্তি কামনা করে কৃত্রিম জলাশয়কেই হ্রদআখ্যা দিয়ে সান্ত্বনা খোঁজে, তবু সমুদ্রের উদ্দাম বিস্তারকে রক্তে অনুভবকরার জন্যে ধূলো-জঞ্জাল মেশানো বেলাভূমিতে সমবেত হয়।

শিল্পপ্রধানমহানগর বোম্বাইয়ে নীল অসীমতার নকল করা পরিহাসের মতো সমুদ্রের তীরেই 'মল্লিকা'র স্বামী শ্রীপতির সঙ্গে সুবিকাশের প্রথম পরিচয়, সে-সূত্রেইপরে মল্লিকা ও শ্রীপতির দাম্পত্য জীবনে তার প্রবেশ। মল্লিকা একদা শ্রীপতিকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করত,ভালোবাসত এবং শ্রীপতিও একদা প্রকৃতই মল্লিকার ওই মনোভ াবের যোগ্যঅধিকারী ছিল আর তার চি যে উঁচু দরের একথা শ্রীপতির ঘরে ঢুকে প্রত্যক্ষঅভিজ্ঞতা থেকে সুবিকাশ জেনেছিল। কিন্তুপরিস্থিতির ফেরে শ্রীপতির

চরিত্র পালটাতে থাকে, তার আচরণ ওপ্রয়োজন পালটাতে থাকে, লোকের কাছে দেনা করাটাই তার পেশাহয়ে দাঁড়ায়, ফলে বন্ধুবান্ধবেরা তাকে ত্যাগ করে, শ্রীপতি ক্রমেই সমাজ থেকেবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্বামীর এইপরিবর্তন সম্বন্ধেমল্লিকা যতই অবহিত ও সচেতন হয় ততই সে-ও নিজেকেগুটিয়ে ফেলে আপনার মধ্যে, স্বামী সম্বন্ধে তার ভূতপূর্ব মনোভাবঅন্তর্হিত হয় এবং উন্মাদনায় সরল সুসংগত দাম্পত্য সম্পর্ক হয়ে ওঠে অনুবর্তিতায় যান্ত্রিক,অভ্যাসের ও অভিনয়ের পৌনঃপুনিকতায় তিক্ত, বিকৃতি গোপনেরপ্রাণান্ত প্রচেষ্টায় অস্বাভাবিক, রহস্যপূর্ণ। অবশেষে এই কৃত্রিম দাম্পত্য সম্পর্কের শৃঙ্খলছিন্ন করে মল্লিকা জীবনের নতুন দিগন্ত অন্বেষণের সিদ্ধান্ত নেয়,কিন্তু শ্রীপতির ঘর ছেড়ে যাত্রার শেষ মুহূর্তে মল্লিকা উপলব্ধি করে যে এইনতুন সীমানার আস্পৃহা আসলে মরীচিকার পেছনে ছোটারই নামান্তর এবংসবদিক থেকে বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন শ্রীপতির সংসারের সীমানার মধ্যেই সম্ভবত তারনিজের অবধারিত গতি। মল্লিকার মতোই প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজেও মধ্যবিত্তের চরিত্রকে গভীর ও নিবিড় রূপে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধাবনের ফলে এই শ্রেণীরপ্রতি বীতশ্রদ্ধ, বিরক্ত, বিরূপ, মোহভঙ্গের হতাশায় এই শ্রেণীর সঙ্গেসমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে উৎসুক, আবার মল্লিকার মতোই নতুন জীবনেরপথে পা বাড়িয়েও পেছিয়ে আসেন, কেননা শ্রেণী-ত্যাগের কল্পনাটা দুঃসাহসীহলেও তাঁর কাছে শেষ পর্যন্ত দুঃসহ ঠেকে। মধ্যবিত্তের ত্রুটি-বিচ্যুতি স্খলন-পতন শঠতা-নীচতাদুর্বলতা-ভীতা প্রেমেন্দ্র মিত্রের চেতনায় যতই বিরাগ জাগাক না কেন, এর প্রতি তাঁর অনুরাগওসমান প্রবল, তাঁর মমতাও সমান সত্য যদিও তা কোথাও উচ্চকিত নয়।

প্রেমেন্দ্রমিত্রের ছোটগল্পগুলি ভাবার্দ্রতা বর্জিত হলেও নিপট হার্দ্য গুণে সম্পন্ন,তাই তাঁর রচনায় নিশ্চিত রূপে ঘৃণ্য অপরাধের আসামীও যথেষ্টপ্রমাণের অভাবে পাঠকের কাছে সন্দেহের অবকাশে মুক্তি পায়। কাউকে যখন প্রথাসিদ্ধ বা পুঁথিবদ্ধনিয়মবিধির পক্ষ থেকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয় তখন সে-বিচারপক্ষপাতমূলক হতে বাধ্য, তখন ভুলে যাওয়া হয় যে এই মানদণ্ড অপরাধবিচারের মানদণ্ড হলেও মানুষ বিচারের পক্ষে শুধু অসম্পূর্ণ নয়,অনুপযুক্তও বটে। প্রেমেন্দ্র মিত্রমানুষ বিচারের জন্যে আইন বা অনুশাসন আশ্রয়ী পূর্বধৃত ভাবসত্ত্বকে তথামূল্যবোধকে অস্বীকার করে হৃদয়ের মানদন্ডে বিচার করে দেখিয়েছেন যে নানারূপ অবস্থার চাপে বা ফাঁদে পড়ে মানুষ এমন অনেক আচরণে বাধ্য হয়যার জন্যে ব্যক্তি হিসেবে তার দায়িত্ব নেই বা থাকলেও নগণ্য। অর্থাৎ ব্যক্তির অতীত শক্তিগুলিরক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার আবর্তে নিপায় ভাবে নিমজ্জিত মধ্যবিত্তেরপ্রাতিস্বিক স্বরূপকেই তিনি অনুধাবন করতে এবং সে-অনুধাবনকেপাঠকের চেতনায় সঞ্চার করতে চেয়েছেন। এর মধ্যে‘সাগর সঙ্গমে’র দাক্ষায়ণী বা ‘জীবন সীমা’-য় মাধবের মতো কেউ কেউ মৃত্যুর মুখোমুখিহয়ে বহিরাশ্রয়ী জীবনের ভিত্তি হিসেবে গ্রাহ্য মূল্যবোধগুলির অসারতা উপলব্ধিকরে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ১৯৬৩-তে লেখা ‘দেখা’ গল্পে বর্ণিত ট্রেনেখোয়া যাওয়া লাগেজের পেছনে ছুটতে গিয়ে রাজধানীর ভিড়ে সুপর্ণাকেহারিয়ে ফেলার মত আধুনিক সমাজ বিত্তসত্যের অন্ধ অন্বেষণে চিত্ত সত্যকেহারিয়েঅনায়াসে হারিয়ে যেতে দিয়েছে এবং যখন সে সত্যের কথা মনে পড়েছেতখন কোনও দিকেই আর তার নিশানা পাচ্ছে না।

সাম্প্রতিক কালের আশুচেতনমানুষের সংকটে আক্রান্ত যে-অস্তিত্ব অভিব্যক্ত তা এক যথাযথ ওশক্তিশালী চিত্রকল্প লাভ করেছে ‘ক্বচি ৎ কখনো’র নামগল্পটিতে। মফস্বলের লোকাল ট্রেনফেল করে লেখককে ঘন্টাখানেকের জন্যে নগণ্য এক স্টেশনে আটকে পড়তেহয়, সেখানেই তিনি গোপীনাথবাবুকে জীবনে প্রথম দেখেন, দুজনের মধ্যে কিছুবাক্যবিনিময়ে প্রকাশ পায় যে দেশের কোনও অগ্রণী ব্যবসায়ীপ্রতিষ্ঠানের অন্যতম অংশীদার হিসেবে গোপীনাথবাবু নিজেকে কল্পনাকরেন ও সেরূপ আত্মমর্যাদাবোধের সঙ্গে আচরণ করেন, কিন্তুপ্রকৃতপক্ষে তিনিক্রিজোফ্রেনিয়ার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পরে স্থানীয় একজন নিম্নস্তরের রেলকর্মচারীর কাছেলেখক জানতে পান যে গোপীনাথবাবু ওই অঞ্চলে প্রথম বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, একদা দেবীপদ গুহ নামে বন্ধুর চরম বিপদেতাকে বাঁচিয়েছিলেন নিজের ভদ্রাসনটুকু রেখে সর্বস্ব বিক্রি করে, তারপরসেই বন্ধু অদৃশ্য হয়ে যায়, গোপীনাথবাবুর স্ত্রীকেও আর পাওয়া যায়নি, কিন্তু গোপীনাথবাবুরবিশ্বাস, দেবীপদ তাঁকে প্রতারণা করতে পারে না, সে আসবেই এবং তাকেনেওয়ার জন্যে প্রতিদিন প্ল্যাটফর্ম টিকিট কিনে তিনি নিয়মিতস্টেশনে আসেন। গল্পটি পাঁচঅঙ্কে বিভক্ত বেদনাদায়ক এক নাটকের অপরূপ কুঞ্জিকা ঃ প্রথমঅঙ্কে লেখক তাঁর লক্ষ্যাভিমুখী ট্রেন ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন, দ্বিতীয়অঙ্কে গোপীনাথবাবুর প্রতি সরকারী চাকুরিহেতু এই মফস্বল শহরেস্থিত স্টেশনমাস্টারের অপমানসূচক ব্যবহার ও প্রত্যুত্তরেগোপীনাথবাবুর অবাধ্যতা, তৃতীয় অঙ্কে লেখকের সঙ্গে গোপীনাথবাবুরঅপ্রকৃতস্থ মানসিকতা থেকেউৎসারিত সংলাপ, চতুর্থ অঙ্কে নিম্নস্তরের রেলকর্মচারী ভৈরব কর্তৃকলেখকের কাছে গোপীনাথবাবুর অতীত জীবনের উন্মোচন, পঞ্চম অঙ্কেবিকেলের ট্রেনে

লেখকের বিদায় ও গোপীনাথবাবুর আরও একটা দিনের ব্যর্থতা।

'ক্বচিৎকখনো' শু হয়েছে লেখকের ব্যক্তিগত বা লৌকিক ব্যর্থতায়, স্টেশনমাস্টারের ব্যবহারে সে-ব্যর্থতা আপনা থেকেই অর্থ হারাতে শু করে ওতার বদলে মমতা জাগে গোপীনাথবাবুর প্রতি, কিন্তু গোপীনাথবাবুর কথায়তাঁর প্রতি মমতা কেটে গিয়ে বিরক্তি জন্ম নেয়, তারপরেইবিরক্তি হয়ে ওঠে বেদনা, অবশেষে বেদনার অ াগুনে দগ্ধ হয়ে ব্যর্থতার লৌকিকধারণা রূপান্তরিত হয় অলৌকিক ধারণায়— এক সর্বজনীনব্যর্থতাজনিত বিদগ্ধ বিষণ্ণতায়। যার শুহয়েছিল লেখকের তুচ্ছ ব্যর্থত ায় তা গোপীনাথবাবুর প্রসঙ্গে প্রসৃতহয়ে উদার ও গভীর হয়েছে এবং অন্তিম চিত্রকল্পে তা সমগ্র আধুনিকসমাজের মোহনায় ব্যঞ্জিত। প্রথমঅঙ্কটি বিবৃতিসার, দ্বিতীয় অঙ্ক বর্ণনামূলক, তৃতীয় অঙ্কেনাটকীয়তার সঞ্চার আর চতুর্থ অঙ্ক বৃত্তান্তগর্ভ, তারপরেইএকটি মাত্র অরোধ্য ও নিশ্চিত আঘাতে এতক্ষণ ধরে অঙ্কে অঙ্কেগে াপনে সযত্ন-সঞ্চিত জীবন-ব্যর্থতার সমস্ত সম্ভাবনাকে পাঠকের সম্মুখেঅপ্রত্যাশিত তাৎপর্যের প্রচ্ছদে লেখক উপস্থাপন করেছেন ঃ'স্টেশন ছেড়ে যাবার সময় জানাল া থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম গোপীনাথবাবু প্ল্যাটফর্মের ধারে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এখানে লাইন গেছে পূর্বে -পশ্চিমে। সূর্য আস্ত যাবার পথে। পশ্চিমে অনেকখানি হেলেছে। সমস্ত আকাশে যেন আগুলের হলকা। সেই অগ্নিবর্ম আকাশের পশ্চাৎপটে মনেহল গোপীনাথবাবু নয়, যেন এ যুগের মানুষেরই লাঞ্ছিত বিপন্ন আত্মমর্যাদাবোধআর বিশ্বাস কণ উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে উদয়-দিগন্তের দিকেচেয়ে আছে'। প্রতিটি শব্দ যেমনসুচিন্তিত ও সুপ্রযুক্ত তেমনই সেগুলির সামগ্রিক বিন্য াসও বাক্যেরদৃঢ়তায় সুপরিকল্পিত ও সাঙ্কেতিকতায় সুসমৃদ্ধ, গোটা বর্ণনারকোথাও বাহুল্য বা শৈথিল্য নেই, আগাগোড়াই তা শব্দসমূহের অটল তন্নিষ্ঠপারম্পর্যে নির্বিকার এবং অন্তিম বাক্যটি অভিধার সম্পন্নতায় নিছিদ্রনীরেট অথচ প্রাঞ্জল বাক্যবন্ধনে প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বাভাবিকক্ষমতার একটা মৃদু নিদর্শন। সমযটা সূর্যাস্তের, লাইনটাও গেছে পূবে পশ্চিমে মানে উদয়থেকে অস্তের দিকে, কিন্তু গোপীনাথবাবুর দৃষ্টি সূর্যাস্তেরবণ৩চছটার দিকে নয়, উদয়দিগন্তের দিকেই নিবদ্ধ। ব্যষ্টিরব্যর্থত ার দর্পনে সমষ্টির ব্যর্থতাকে প্রতিফলিত করার শক্তিরপরিচয় প্রেমেন্দ্র মিত্র বহুবার দিয়েছেন, কিন্তু এখানে গোপীনাথবাবু সমগ্রআধুনিক মানুষের নয়, সমষ্টির নয়, ম ানুষের ভিতরকার বোধ-বিশ্বাসেরপ্রতীক এবং সেজন্যেই উদয়-দিগন্তের দিকে তাঁর দৃষ্টি।

যেমন'ক্বচিৎ-কখনো' গল্পটিতে ট্রেন ফেল করার মতো ছোট ব্যর্থতাঘটনাস্রোতের বাঁকে বাঁকে ঘুরে ও একই খাতে বয়ে লাভ করেছে অতল ওসার্বিক ব্যর্থতার ত াৎপর্য তেমনই প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্তউৎকৃষ্ট ছোটগল্পে এক-একটি অভিজ্ঞতা বা অন্বীক্ষা প্রসঙ্গেরঅগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একই প্রণালীতে অনবচ্ছিন্ন রূপে প্রবাহিত হয়েত্রমাগত বিস্তৃত ও প্রগাঢ় অর্থময়তায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। তাঁর সমস্ত রচনাতেই আকর্ষণীয়আড়ম্বর, উজ্জ্বলতা ও ক্ষিপ্রতার বিলক্ষণ অনটন চোখে পড়ে,শব্দের অপব্যয় বা অনর্থক ব্যবহার তাঁর ধাতে একেবারে অসহ্য এবং উচচরিতশব্দসমূহের অথবা বর্ণিত ঘটনার তাৎকালিক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বক্তব্যেরঅতীত এক ব্যঞ্জনা বহনের গুভারে তাঁর ভাষা গম্ভীর , মন্থর এবংস্বায়ত্তশাসিত সংহতির অপূর্ব নিদর্শন। 'সংসার সীমান্তের' শেষে বলেছেন, 'ডিবিয়ারধূমবহুল শিখাকে শীর্ণ হাতে সযত্নে বৃষ্টির ঝাপটা হইতে আড়াল করিয়াগভীর রাত্রি পর্যন্ত এখনও নিশ্চয় বিগতযৌবনা রূপহীনা রজনী এক রাত্রেরঅতিথির জন্য হতাশনয়নে পথের দিকে চাহিয় া প্রতীক্ষা করে।' এই ব্যাকরণস্বচ্ছন্দ বহুলাঙ্গ বাক্যেঅসমাপিকা ক্রিয়া দুটির সংস্থাপন এমন সুকৌশলে সম্পন্ন যে তাদেরঅস্তিত্ব এবং বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষণ এমন নিপুণ সন্নিবন্ধে প্রযুক্ত যেতাদের আস্রবণ সহজে চোখেই পড়ে না, ব্যাকরণিক বিশ্লেষণের কূট-ক্রিয়াকেবাদ দিয়ে শুধু মর্ম-বিশ্লেষণেও ধরা পড়ে যে এই বাক্যে রজনীর জীবনেরসমস্ত দৈন্য, ক্ষয়, অকৃতার্থতা ও অন্তহীন প্রতীক্ষানিত্যবৃত্ত বর্তমানে সংবৃত। আবারস্বভাবনির্গত বাংলা ভাষায় 'মহানগর' গল্পটির মুখবন্ধে তৎসম,তদ্‌ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দের পাশাপাশি বিভিন্ন গুণবাচক শব্দের সমাবেশে সিদ্ধঅব্যর্থ সংবদ্ধতা ও সামঞ্জস্য, গাম্ভীর্য ও দার্ঢ্য পাঠকের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উদ্রেককরে।

একথা ঠিক যেছোটগল্পের ধর্মপালনে মুখবন্ধ রচনার কোনও অবকাশ নেই, এবং সেদিক থেকে'মহানগর' গল্পটি মুখবন্ধ সংবলিত বললে ছোটগল্প হিসেবে ত ারত্রুটিই নির্দেশিত হয়, কিন্তু তলিয়ে দেখলেই মানতে হবে যে উক্ত গল্পের শুচরিত্রের মানে রতনের প্রবেশের থেকে নয়, তার অনেক আগে থেকেইঅর্থাৎ যে অংশকে মুখবন্ধ বলে মনে হতে পারে সেখান থেকেই ছোটগল্প শু হয়েগেছে, চরিত্র-শূন্য বলে প্রথম কয়টি অনুচ্ছেদ মূল গল্পের পক্ষেঅনাবশ্যক বা বাহুল্য তো নয়ই, উপরন্তু এখানে উদঘাটিত হয়েছে বিশেষ রূপেএকালের মহানগরের বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য, উচচকিত জটিলতা ও বিশালতা,উত্তেজনা ও অবসাদ, তার উলঙ্গ বীভৎসতা ও অস্ফুট সৌন্দর্য, অমানুষিক নিষ্ঠুরতাও অন্তর্লীন কণা, সামাজিক পরাভব ও নিঃসঙ্গ বলিষ্ঠতা, এক কথায় আধুনিক সমাজের প্রধানঘটনাস্থল যাকে বলা

যায় তার প্রকৃতি-প্রকাশক ওই মুখবন্ধকেডিঙিয়ে গল্পটি পড়া শু করলে 'মহানগরে'র মূল তাৎপর্যপাঠকের কাছে অনায়ত্তই থেকে যাবে। প্রথম কয়েকটি অনুচ্ছেদকে আলাদা করে বোঝাবার জন্যেমুখবন্ধশব্দটি ব্যবহৃত হলেও প্রচলিত অর্থে শব্দটি গ্রাহ্য নয়। 'আমার সঙ্গে চলো মহানগরে— যেমহানগর ছড়িয়ে আছে আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মতো, আবারযে-মহানগর উঠেছে মিনারে মন্দিরচূড়ায়, আর অভ্রভেদী প্রাসাদ-শিখরেতারাদের দিকে, প্রার্থনার মতো মানবাত্মার দিকে' এইভাবেগল্পটি শু করার সঙ্গে সঙ্গেই ছোটগল্পের জন্যে আবশ্যিকনির্মাণপ্রক্রিয়া শু হয়ে গেছে, আবার গল্পটির অন্তিম বাক্য,'মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মতা গাঢ়' প্রথম বাক্যটিরসঙ্গে চিত্রকল্পগুলির অনিবার্য্য অবিচ্ছেদ্য প্রবাহের সূত্রে নিবিড়ভাবেগ্রথিত এবং এর ফলেই গল্পটি এক অখণ্ড সমগ্র ও সসুমঞ্জস ভাবমণ্ডলে বিকশিতহয়েছে।

আবার 'মল্লিকা' গল্পেরশুটা—'শুভ্র স্বপ্ন-বিস্তার নয়, ধুলো জঞ্জাল মেশানোখানিকটা ময়লা বালি ছড়ানো জায়গা। সমুদ্রের সানন্দ দান নয়, মনে হয় পয়সা নিয়ে ফরমাশমতো কেউবুঝি ঢেলে দিয়ে গেছে এই চোপাটি। সমুদ্রও আছে, যেন নীল অসীমতার নকল করা পরিহাস'—পড়ামাত্রপাঠক এমন এক পরিবেশে নিজের উপস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত হয় যেখানেসমস্ত কিছুই পয়সার মাপকাঠিতে বিচার করা হয় বা পাওয়া যায়, সেখানে সমস্তইযান্ত্রিকতায় কলুষিত, মানুষের নির্বোধ আত্মবঞ্চনায় শোচনীয়, সমস্তইঅস্বাভাবিক ও কৃত্রিম এবং তারপরে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে এইপরিবেশের অধীন মানষগুলোর জীবনের অস্থিরতা অনির্দেশ্যতা অপ্রকৃতিস্থতা অসহায়তা মূর্ত হয়ে ওঠে এবং সবশেষে যখন'স্টেশন কাঁপিয়ে অজানা দূরের যাত্রী ট্রেনের হুইসিল বাজল' তখনসমস্ত আধুনিক মানুষের অস্তিত্বের চরম তুচ্ছতাই ভয়ঙ্করতীক্ষ্ণ ও তীব্র হয়ে সহসা পাঠকের বুকে বেজে ওঠে।

ছোটগল্পখণ্ডের মধ্যে অখণ্ডকে সংবৃত রাখে, বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর স্বাদকে সঞ্চিত করে,প্রতীকের মধ্যে বহন করে প্রকৃতিকে। এই ধারণা অনুসারী প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত ছোটগল্পেইদুটি সুস্পষ্ট স্তর বিদ্যমান। একটি স্তরে জাগে এক সুসঙ্গত অভিভাবের নির্দিষ্ট সীমানারমধ্যে একটি মাত্র প্রসঙ্গের ঋিস্ত বিস্তারের অথবাউপস্থাপিত চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের কিংবা কোনও বিশেষচরিত্রের একটি মাত্র সমস্যার ভিত্তিতে গঠিত আখ্যানের পূর্বানুমিত এক চরমমুহূর্তে উপস্থিত হওয়ার দণ প্রতিক্রিয়া, কিন্তু এইঅভিপ্রেত প্রতিক্রিয়া জাগাবার ব্যাপারে ঘটনার ঘনঘটা অথবানাটকীয়তা সৃষ্টির প্রয়োজন তাঁর হয় না। জীবনসংগ্রামের মতো দাণ একটাকাণ্ডকারখানাকে যারা সম্পূর্ণ নীরবে ও সবার অগোচরে সম্পন্ন করে কোনওবড়ো আয়োজন ছাড়াই, তাঁর প্রথম স্তরের গল্পগুলি সেইসবসাধারণ মানুষের প্রতিদিনের তুচ্ছ সব ঘটনার অন্তরঙ্গ ভাষায়বিবরণ। তবু এই বিবরণ পাঠে একঅস্বস্তি থেকে যায়, বোধির একটা উদ্দীপনা জাগে, কেননা গল্পগুলিপড়তে পড়তে সর্বদাই মনে হয়, লেখক যেন কিছুই ভেঙে বলবেন না বলে বদ্ধপরিকর,সামান্য আখ্যানের আড়ালে অসামান্য ব্যঞ্জনাকে গোপনের তপস্যায় আসীন এবংপ্রকৃত তাঁর ছোটগল্পগুলি সেই লুক্কায়িত কথাটাকেই খুঁজেবের করার জন্যে সহৃদয়সংবাদী পাঠকের প্রতি দুর্মর প্রণোদনা। তাঁর গল্পগুলি শিল্পকৌশলেঅদ্বিতীয় ও অভিনব এবং স্বল্পতম পরিসরে বহুতরপ্রবর্তনারপ্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ঃ সেখানে নিষ্কর্ষিতঅভিজ্ঞতার কোনও প্রবেশ নেই ঃ দাণভাবে ইঙ্গিতগর্ভ বলেই তাঁরগরল্প পুনর্কথনের পক্ষে একেবারে অযোগ্য এবং এই অযোগ্যতা প্রকৃতপ্রস্তাবেপ্রসঙ্গ ও প্রকাশের, অভিজ্ঞা ও অভিজ্ঞানের আশর্চ্য সমন্বয়ে অদ্বৈতসিদ্ধিরইএখানেই উন্মীলিত হয় তাঁর ছোটগল্পগুলির পূর্বোল্লিখিত দ্বিতীয়স্তরঃ দেশ-কাল-পাত্র-গত প্রতীতির অভিঘাতে লেখকের চেতনায় যেআলোড়নের সূত্রপাত তারই অন্তিম পরিণাম দৃশ্যমান হয়ে ওঠে তাঁরছোটগল্পগুলিতে অর্থাৎ একালের শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্ন্তগত অথবানিকট অনুবন্ধী বিভিন্নচরিত্রকে নিয়ে লেখা তাঁর সার্থক রচনাগুলি শুধুবিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নয়, সামগ্রিকভাবে উক্ত শ্রেণীর স্বভাব ওস্বরূপের—ঐকান্তিক প্রকৃতির —অনবদ্য শিল্পগুণেসমৃদ্ধ প্রকাশ, ব্যক্তিগত মনীষায় মধ্যবিত্তের শ্রেণীগত মানসের অখণ্ড অমেঘঅবিকল রসাত্মক রূপায়ণ। এই শ্রেণীরবাইরে তিনি ক্বচিৎ কখনও পদক্ষেপ করেছেন, কিন্তু তাঁর পদচারণারক্ষেত্র সংকীর্ণ বলেই তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টি সর্বদা একাগ্র ও সুতীক্ষ্ণ এবং এই ক্ষেত্র প্রসঙ্গেতাঁর অনুধাবনা সর্বদা আন্তরিক ও যথার্থ, একটি ক্ষুদ্র ক্ষেত্রেরমধ্যেও কত উপসর্গ, কত কৌণিকতা, কত প্রান্তিকতা , কতসুরভেদ, কত কুটিল স্রোত ও জটিল সুড়ঙ্গ, কত উদাত্ত আকাঙ্খার মধ্যে কতগোপন অলিগলি থাকতে পারে বা আছে প্রেমেন্দ্র মিত্র তা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপেঅন্বেষণ ও বিশ্লেষণ করে তাঁর সার্বিক মনোভঙ্গির পরিচয় পাঠকেরসম্মুখে উপস্থাপন করেছেন।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com